আমার
ঘরের আশেপাশে

ডঃ তারকমোহন দাস

এম.এস-সি., পি.এইচ-ডি. (লণ্ডন), ডি.আই.সি.

রীডার, কৃষি বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

শ্রীপরিমল গোস্বামীর

করকমলে

এস. এন. বোস
ন্যাশনাল প্রোফেসর

বাংলায় বিজ্ঞানের কথা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। আমি বহুদিন এই কথা নানা স্থানে বলে এসেছি। আজ দেখে সন্তোষ লাভ করলাম শ্রীমান তারকমোহন, আমাদের আশেপাশে উদ্ভিদ জগতের যে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যের নমুনা রয়েছে তা সংগ্রহ করে সহজ ভাষায় সাধারণকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, বর্ণনার রূপও দিয়েছেন অনেক ছবির মধ্যে।

উদ্ভিদবিদ্যার এই অঙ্গ অপেক্ষাকৃত নীরস বলে অখ্যাতি আছে—সেটা আমার মনে হয় অসঙ্গত। শ্রীমান তারকমোহনের প্রবন্ধগুলি যখন যুগান্তর সাময়িকীতে ছাপা হত, তখন ছাত্রমহলে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ একত্র করে ছাপা হতে দেখে আমি খুসী হয়েছি। এ বই শুধু কৌতূহলীর কৌতূহলকে চরিতার্থ করবে তাই নয়, বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও সাহায্য করবে।

এইভাবে তরুণ বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হোন বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের পরিবেশন করতে, তাহলে অসার বাক্‌বিতণ্ডার অবসান হবে ও ভবিষ্যতের দেশ গঠনে আমরা কয়েক পা এগিয়ে যাব।

এই প্রচেষ্টার জন্য শ্রীমানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সত্যেন বোস

ভূমিকা

নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় আজ শুধু নদনদী ও স্থাপত্য-কীর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেশের পশুপক্ষী ও গাছপালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। উদ্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি। ইতিহাসের পাতা ওলটালে তাই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছে বৃক্ষ দেবতা। যে সব আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা তাদের অতুলনীয় রূপ, রস ও সৌরভের সঙ্গে আমাদের রুচি ও রসবোধ কত নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। এই সব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তারা আজও পথে-প্রান্তরে জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্ত রঙীন করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নির্লিপ্ত দৃষ্টির সম্মুখেই।—কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? আমাদের জাতীয়-মানস ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ?—সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বইএর মূল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন বোধে কয়েকটি বিদেশী গাছেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে রবিবারের 'যুগান্তরে' এবং কিছু অংশ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছাতেই এই রচনাটি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। তিনি আমার সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ছবিগুলি এঁকে সহায়তা করেছেন শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার,

তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'যুগান্তরে'র সৌজন্যে ছবির ব্লকগুলি পাওয়ায় তাঁদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উদ্ভিদ বিষয়ে আমাদের উত্তরাধিকারঃ উদ্ভিদের রূপ, রস, ব্যাপ্তি, সজীবতা ও সহনশীলতাকে প্রাচীন ভারতীয়রা জীবনের আদর্শরূপে গণ্য করতেন। কঠোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ঊর্ধ্বমূলোঽবাকশাখ
এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।

এই অশ্বত্থ গাছের ছায়া ও আশ্রয়দানের তাৎপর্যকে উপনিষদে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেও অশ্বত্থের গরিমা অতুলনীয়। বোধিদ্রুমের ছায়ায় বসেই ভগবান তথাগত বোধি লাভ করেছিলেন। অশ্বত্থের মত আরো কয়েকটি ভারতবর্ষের নিজস্ব গাছ যেমন বট, আম্র, শাল, শাল্মলী, পদ্ম, চম্পক, কদম্ব আমাদের প্রাচীন দর্শন ও কাব্য গ্রন্থগুলিতে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। সেকালে ফুলের মধ্যে পদ্মই ছিল পুষ্পরাজ, আদি কবি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের সুনীল চোখের সঙ্গে নীল পদ্মের তুলনা করেছিলেন, সম্ভবতঃ সেই থেকেই পদ্ম এক স্বতন্ত্র্য সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নিয়ে ভারতের জাতীয়-মানসে ধরা দিয়েছে। বিভিন্ন রঙের পদ্ম বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন শ্বেত পদ্মের নাম পুণ্ডরীক ও অরবিন্দ, নীল পদ্মের নাম কুবলয় ও ইন্দীবর, লাল পদ্মের নাম কোকনদ। এত রঙের পদ্ম সত্যই ভারতে ছিল কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আজ অবশ্য সন্দেহ করে থাকেন, তাঁরা মনে করেন এগুলি রঙীন শালুকেরই বিভিন্ন নাম। মহাকবি কালিদাস তাঁর বিভিন্ন কাব্যে প্রায় একচল্লিশটি বিভিন্ন ফুলের উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রিয় ফুল-গুলি হচ্ছে কর্ণিকার, কুরবক, কুন্দ, কেতকী, লোধ্র, অশোক, কিংশুক, শিরীষ, আম্রমঞ্জরী, বকুল, বন্ধুক, নীপ, মালতী, তিলক, কুমুদ, পদ্ম এবং পারিজাত। মহাকবি শুধু সৌরভময় অভিজাত

ফুলগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হননি তিনি শিলীন্ধ্রা, কন্দলী (বেঙের ছাতা? ভুঁই চাঁপা?), কাশ মঞ্জরী ও বেতস মঞ্জরীর মত বনফুলকেও সযত্নে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যে, যদিও খুব ব্যাপক ভাবে নয়। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব গীতিকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস এবং শাক্ত সাধকদের কয়েকটি বিশেষ ফুলের ওপর পক্ষপাতিত্ব বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে। বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে নীপ ও চম্পকের স্তুতি অজস্র ছড়িয়ে আছে। শাক্ত সাধকেরা জবা, জয়ন্তী ও অপরাজিতার রং ও পাপড়ির বিন্যাসের সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই জবা বা অপরাজিতা শ্রেণীর ফুলগুলিকে বলা হয় যন্ত্রপুষ্পম্। মহাকালীর বিভিন্ন অঙ্গের রূপের সঙ্গে তুলনীয় এই ফুলগুলি।

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা শুধু বৃক্ষলতার সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন ছিলেন তাই নয়—তাঁরা উদ্ভিদের জীবনতত্ত্ব, তাদের ব্যবহার-রীতি ও গুণাগুণ সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এই বিষয়ে আমাদের উত্তরাধিকার গর্ব করার মত। প্রায় দু হাজার গাছের নাম তাঁরা জানতেন, ব্রহ্মদেশ সমেত অবিভক্ত ভারতের সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা হল প্রায় চৌদ্দ হাজার। শুধু ফুল বা ফলের গাছ নয়, ছত্রাক ও শৈবালের মত পুষ্পহীন নগণ্য উদ্ভিদের প্রতিও তাঁরা যথেষ্ট কুতূহলী ছিলেন। ঋগ্‌বেদে প্রায় ১০৭ রকম উদ্ভিদের নাম করা হয়েছে ভেষজ হিসাবে। অথর্ববেদে এর থেকে আরো অনেক বেশী সংখ্যক উদ্ভিদের নাম আছে। বৈদিক যুগের পূর্বেও কিন্তু উদ্ভিদের ব্যাপক ব্যবহার জানা ছিল। মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় আর্যদের ভারতে আসবার অন্ততঃ এক হাজার বছর আগে এই সিন্ধুবিধৌত উপত্যকায় যাঁরা বাস করতেন তাঁরা গমের চাষ জানতেন, তাঁরা যে জাতের গম চাষ করতেন তার নাম ট্রিটিকাম্ ভালগেয়ার, প্রাচীন মিশরীয়রা ঠিক এই জাতের গমই চাষ করতেন, আমরা আজও এই জাতের গম ব্যবহার করে থাকি।

বৈদিক যুগে উদ্ভিদশাস্ত্র ও ভেষজ বিজ্ঞানে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরবর্তী চরক ও সুশ্রুতের যুগে এই জ্ঞান পৌঁছেছিল উত্তুঙ্গ শিখরে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের হাতে এমন যথেষ্ট তথ্য নেই যার সাহায্যে এই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে দেববৈদ্য ধন্বন্তরির রচনা, মহর্ষি চরকের লেখা 'চরক-সংহিতা', এবং সুশ্রুতের লেখা 'সুশ্রুত-সংহিতা' এগুলি অতি বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ; এছাড়া চক্রদত্ত, ভাবমিশ্র, রাজভট্ট ও মদনপালের লেখা গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব গ্রন্থে অতি সরস সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে গাছপালার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই স্বর্ণযুগে উদ্ভিদ জীবনের অনেক গভীর ও মূল বিষয়ও লক্ষ্য করা হয়েছিল। যেমন, আকার ও ভেষজ গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ তৈরী করা হয়েছিল। উদ্ভিদের প্রজাতি (স্পেসিস্) ও প্রকারের (ভ্যারাইটি) মধ্যকার ব্যবধানটিও জানা ছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় উদ্ভিদের মধ্যে লিঙ্গভেদ অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ দুটি পৃথক সত্তার অস্তিত্বও কল্পনা করা হয়েছিল। শাঙ্খ দর্শনে জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও কিছু যুক্তিসহ মৌলিক তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া উদ্ভিদের দেহবিজ্ঞান সম্পর্কেও কিছু তথ্য আছে,—যেমন বীজ বপন প্রণালী, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলন, জমিতে জৈবসার প্রয়োগের তাৎপর্য ইত্যাদি; মহর্ষি পরাশরের মতে উদ্ভিদেরা ঠাণ্ডা, উত্তাপ ও বজ্রের শব্দের প্রতি সংবেদনশীল। এই প্রসঙ্গে শার্ঙ্গধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শার্ঙ্গধর বুন্দেলখণ্ডের রাজা হামীরের (১২৮৩—১৩০১ খৃষ্টাব্দ) সভাসদ ছিলেন। তিনি 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থে দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, উদ্ভিদপালন তত্ত্ব, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিদ্যা সম্পর্কেই বিস্তৃত তথ্য বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে লিখে গিয়েছেন। শার্ঙ্গধরের গ্রন্থের একটি অংশের নাম 'উপবন-বিনোদ', এই অংশে তিনি গাছপালার জন্য জমি নির্বাচন,

বীজ বপন, গাছের পুষ্টি ও কৃষির জন্য নানারকম ব্যবস্থা, রোগের আক্রমণ থেকে গাছকে বাঁচাবার জন্য নানাবিধ উপায়, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি নানারকম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কথা সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করে গেছেন। এই গ্রন্থটি মধ্যযুগের ভারতের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি অতি মূল্যবান দলিল। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্পর্কে আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হল 'বৃক্ষ-আয়ুর্বেদ'। মানুষের মত গাছপালাও যে নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে এবং কি কি বাস্তব উপায় অবলম্বন করলে এই সব ব্যাধি দূর হতে পারে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে এই গ্রন্থে। কৃষিবিজ্ঞানে বরাহ, মিহির এবং বিশেষ করে খনার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। খনার বচনগুলিতে আবহাওয়ার সঙ্গে উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ফসল উন্নয়নের জন্য নানারকম বাস্তব উপায় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া আছে। এইসব একত্র করলে সহজেই বোঝা যায় উদ্ভিদ সম্পর্কে আমাদের উত্তরাধিকার মোটেই নগণ্য নয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে এই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা আমাদের দেশে রক্ষিত হয় নি। আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞান উত্তরোত্তর বর্ধিত গতি ও ব্যাপকতা নিয়ে তার প্রতিশ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে নি,—সমাজের কঠোর নিগড় ভেঙ্গেচুরে তাকে আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর করে তুলতে পারে নি,—পক্ষান্তরে এই অচলায়তনেই ক্রমান্বয় ঘা খেয়ে খেয়ে তার নিজস্ব বেগ ও ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছে। গত আড়াইশো বছরে আমরা যা বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছি, এদেশের মাটিতেই তার কিছুটা ফলবার সম্ভাবনা ছিল, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

তারকমোহন দাস

এক

আমাদের দেশে উদ্ভিদবিদ্যা-চর্চার নবযুগের সূচনা হয়েছিল ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী নদীর তীরে শিবপুর অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান বোটানি-ক্যাল গার্ডেনের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। এই বাগান যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি নিজে উদ্ভিদতত্ত্বের বড় একটা ধার ধারতেন না। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে মসলা, সাবু, সেগুন, মেহগিনি প্রভৃতি কয়েকটি মূল্যবান ফসলের আবাদ করা, বাংলাদেশের মাটিতে মসলা ও দামী টিম্বারের স্বর্ণপ্রসূ সম্ভাবনার স্বপ্ন তাঁর চোখে ছিল। এনার নাম হল কর্ণেল রবার্ট কিড্। কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের কিড্ স্ট্রীটের নাম সকলেই শুনেছেন, অনেকেই এ-রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন, কিন্তু এই রাস্তার এককালের বাসিন্দা কিড্ সাহেবই যে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা সে খবর খুব কম লোকেই জানেন। ইনি ছিলেন সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ ঘাটার সুপারিণ্টেনডেণ্ট ও ফোর্ট উইলিয়ামের মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ম্যাক্ফারসনের দরবারে ইনি এই বাগান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি প্রথম পেশ করেন। ম্যাক্ফারসন তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বদলী কাজ করছিলেন। তিনি অবিলম্বে কর্ণেল কিডের প্রস্তাবটি কাজে লাগান। কর্ণেল কিড্ বাগান প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তিনিই এর প্রথম অবৈতনিক সুপারিণ্টেনডেণ্ট রূপে ছিলেন ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ অবধি। কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই বাগানের প্রতিষ্ঠা বলে বহুকাল অবধি সাধারণের কাছে এই বাগানের নাম ছিল কোম্পানীর বাগান। ১৭৯৩ সালে কিড্ সাহেব মারা যান, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মসলার আবাদের

স্বপ্ন বিশেষ সফল হয়নি এবং তাঁর মৃত্যুর পর তা গিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী হয়ে। কিড্ সাহেবের পর যিনি এই বাগানের ভার গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন সে-যুগের একজন দিক্‌পাল উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্। এনার নাম ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারো এম. ডি। এনার আর একটি নাম আছে তা হল 'ফাদার অব্ ইণ্ডিয়ান বোটানী'। ইনি জীবনের দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে ভারতবর্ষের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে গিয়েছেন। ইনিই ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা-চর্চার নবযুগের প্রবর্তক।

ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারোর গবেষণার পেছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট সমর্থন ও স্বার্থ জড়িত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সদ্যবিজিত ভারতের অফুরন্ত কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের একটা মূল্যায়নের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদেরই স্বার্থে এই সময় কয়েকজন অতি দক্ষ ইংরাজ প্রাণীতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ও ভূতত্ত্ববিদ্ আমাদের দেশে এসেছিলেন। সাপ, মশা ও বাঘের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে তাঁরা ভারতের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত তন্ন তন্ন করে খুঁজে এদেশের পশুপক্ষী, গাছপালা ও খনিজ সম্পদের কতকগুলি বিস্তৃত সমীক্ষা করে গিয়েছেন। পরোক্ষভাবে তাঁরাই এদেশে আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের জনক।

এই দলেই ছিলেন ডক্টর উইলিয়ম রক্সবারো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভুক উদ্ভিদতত্ত্ববিদরূপে ইনি প্রথম মাদ্রাজে নেমেছিলেন ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে; তারপর শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনকে কেন্দ্র করে ভারতে উদ্ভিদতত্ত্ব-চর্চার ঐতিহ্যধারা গড়ে তোলেন। এনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'ফ্লোরাইণ্ডিকা'। এই গ্রন্থে ভারতের উদ্ভিদ সম্পদের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রক্সবারো সাহেবের পর আরো কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদতত্ত্ববিদের হাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে নাথানিয়েল ওয়ালিচ্, স্যার জর্জ কিং,

স্যার ডেভিড্ প্রেণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ফ্লোরা অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া'র লেখক স্যার জে. ডি. হুকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে দুবার এসেছিলেন—একবার ১৮৫৮ সালে, অন্যবার ১৮৬০ সালে। ব্রহ্মদেশ সমেত অবিভক্ত ভারতের উদ্ভিদ সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ এনার গ্রন্থে আমরা পাই।

সেকালে উদ্ভিদবিদ্যা অংশত চিকিৎসাবিজ্ঞানেরই অন্তর্গত ছিল। রক্সবারো সাহেব ও কিং সাহেবের উপাধি ছিল এম. ডি। ওয়ালিচ্ সাহেব ও কিং সাহেব বাগানের সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন আবার কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের বোটানীর প্রফেসরও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকরূপে উইলিয়াম কেরীর নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে, কিন্তু তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে অনেকেই যা জানেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি উদ্ভিদরসিক ব্যক্তি। ১৮২০ সালে তিনি রয়েল এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টি-কালচারাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটি এককালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যেই ছিল। তারপর ১৮৭২ সালে উঠে আসে আলিপুরে বর্তমান ন্যাশানাল লাইব্রেরীর পাশে। এক সময়ে উইলিয়ম কেরীকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপরিণ্টেনডেণ্টের পদে নিয়োগ করবার জন্যও কথাবার্তা হয়েছিল। সেকালে ভারতে উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ। শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর একটি সুন্দর বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল। এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রাক্তন সেক্রেটারী পার্শী ল্যাঙ্কাস্টারের মতে সেকালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরই উদ্ভিদ সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিল কেরী সাহেবের বোটানিক্যাল গার্ডেন। কেরী সাহেবই শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারোর 'ফ্লোরাইণ্ডিকা' প্রকাশ করেন।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দীর্ঘ ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি ও শান্তির মধ্যে কাটেনি। ১৮৬৪ সালে একবার কলকাতার ওপর

দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল, তার ফলে এই বাগানের ক্ষতি হয়েছিল অবর্ণনীয়। প্রায় এক হাজারের ওপর অতি দুষ্প্রাপ্য গাছ ঝড়ে পড়ে যায়। হুগলী নদীর প্রচণ্ড প্লাবন বাগানের মধ্যেও ঢুকেছিল। শোনা যায় বাগানের মধ্যে কোথাও কোথাও ছ-সাত ফুট উঁচু জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই ঝড় ও প্লাবনে ভেসে হুগলী নদী থেকে দুটি জাহাজ বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এর ঠিক তিন বছর পরে আরও একটি প্রচণ্ড ঝড়ে এই বাগানের ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট।

বাগানে দুবার বাঘেরও পদার্পণ ঘটেছিল। ১৮৭৯ সালের ৯ই জানুয়ারী কিউরেটার বিয়েরম্যান সাহেব বাগানের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড বাঘিনীর আক্রমণে মারাত্মক ভাবে আহত হন। এই ঘটনার ছয়মাসের মধ্যে একটা বিরাট কালো প্যান্থার বাগানের মধ্যে এক গাছের তলায় সারারাত্রি ধরে পরম সুখে নিদ্রা দিয়েছিল। পরদিন সকালে কিং সাহেব গুলি করে প্যান্থারটির সুখনিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত করেন। এই দুটি পশুই উদ্যানকে অরণ্য ভেবে পুনর্বাসনের খোঁজে এসেছিল হুগলী নদী সাঁতরে পার হয়ে। তারা দুজনেই এসেছিল নদীর ওপার থেকে অযোধ্যার নবাবের খাঁচা ভেঙ্গে।

ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যে বিখ্যাত, এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এই বোটানিক্যাল গার্ডেনের বৃক্ষলতা ও গুল্মের সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজারের ওপর, এর অতি বিশাল বটগাছটি এবং বিরাট উদ্ভিদ সংরক্ষণশালাটি (হারবেরিয়াম) পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ। পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতের প্রায় পঁচিশ লক্ষের ওপর উদ্ভিদ সযত্নে সংরক্ষিত আছে এর উদ্ভিদ সংরক্ষণশালায়। এটি কিং সাহেবের আমলে তৈরী হয়েছিল, গত বিশ বছর ধরে উদ্ভিদরসিক ডক্টর সুশীল মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে এই উদ্ভিদ সংরক্ষণশালার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এর পাঠাগারে উদ্ভিদ সম্পর্কীয় বই ও পত্রিকা আছে প্রায় পঁচিশ হাজারের ওপর।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই বাগান লণ্ডনের কিউ গার্ডেন থেকেও

বেশী পুরাতন। আনুষ্ঠানিকভাবে টেমস নদীর তীরে কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে। তখন তার আয়তন ছিল মাত্র পনেরো একর, আজ তা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে প্রায় ২৮৮ একরে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক এর ৫৪ বছর আগে ১৭৮৭ সালে, তখন এর আয়তন ছিল ৩১০ একর, কিন্তু এই আয়তন ক্রমশঃ কমতে কমতে এখন এসে দাঁড়িয়েছে ২৭৩ একরে। আজ যেখানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দাঁড়িয়ে আছে সেটাও ছিল কোম্পানীর বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে, সেখানে সেগুন গাছের সুন্দর একটি আবাদ ছিল। কিউ গার্ডেন ও শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই দুটি বাগানের উদ্ভিদ সংরক্ষণশালা নদীর তীরে তৈরী করা হয়েছে, একটি টেমসের অপরটি হুগলীর। বাস্তবিক পক্ষে বয়োজ্যেষ্ঠ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেই একদিন কিউ-এর সংগঠন ও প্রশাসন ব্যবস্থার ছক আঁকা হয়েছিল। সেই সময় শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহে সেই যুগের সেরা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। তাঁদের গবেষণার ফল সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। হুকার সাহেব যে প্রণালীতে ভারতীয় উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন (বেনথাম্ এণ্ড হুকার সিস্টেম অব ক্লাসিফিকেশন) তা আজও পৃথিবীর অধিকাংশ বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনুসরণ করা হয়ে থাকে—এই বাগানের বিশাল উদ্ভিদ সম্পদ, শান্ত সবুজ পরিবেশ এবং উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর গবেষণার ঐতিহ্যধারা আমাদের এক মূল্যবান জাতীয় সম্পদ।

এইবার প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক, আমরা যে সব গাছপালা চারিদিকে দেখি তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা যাক।

চালতা ঃ বাংলাদেশ ও কলকাতার আশেপাশে চালতা গাছ বেশ কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। চালতার মূল্য কম তাই কৌলীন্য নেই। কিন্তু নিছক সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় চালতাগাছ অনেক কুলীন গাছকেও হারিয়ে দেয়। এর ঘন সবুজ করাতের মত কিনারাওলা পাতার বাহার, হাল্কা মিঠে গন্ধওলা সাদা বড় বড় ফুল এক সৌন্দর্যময় পরিবেশ রচনা করে। আমের মত এর পাতাগুলি বারমাসই গাছকে সবুজ করে রাখে, সময় সময় এত ঘন সবুজ করে তোলে যে আশে-পাশের বাড়ীর জানালার আলো রোধ করে রাখে। সম্ভবতঃ তাই-জন্য অনেকে বাড়ীর খুব কাছে চালতা গাছ রাখতে চান না।

চালতা

চালতাগাছের রূপে বাঙালী না মজলেও তার রসে আমরা মজে আছি, চালতার গুড় অম্বল —বিশেষতঃ চিংড়িমাছ সহযোগে বাঙালীর একান্ত প্রিয় বস্তু। চালতার সরবৎও শরীরের পক্ষে খুব উপকারী আর ঠাণ্ডা। চালতার ফুল ধরে বর্ষার প্রারম্ভে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে,—সাদা পাঁচ পাঁপড়ি যুক্ত অজস্র বড় বড় ফুল হাল্কা গন্ধে ভরিয়ে রাখে চতুর্দিক, ফুলের দলগুলি ঝরে পড়ে শীঘ্রই, কিন্তু বৃত্যাংশগুলি ক্রমশঃ পুরু হয়ে চালতা ফলে পরিণত হয় যার ভিতরে থাকে বীজ এবং পুং ও স্ত্রী অংশগুলির শুষ্ক অবশেষ। ভাদ্র ও আশ্বিনে চালতা পাকে। চালতার কাঠ অনেক কাজের, বন্দুকের

কুঁদো ও নৌকা তৈরীর কাজে লাগে। জলের তলায় চালতার কাঠ রেখে দিলে নিকষ কালো রং ধরে আর বহুদিন স্থায়ী হয়। চালতার বৈজ্ঞানিক নাম ডিলেনিয়া ইণ্ডিকা, চালতা যে গোত্রের (ফ্যামিলি) অন্তর্গত তার নাম ডিলেনিয়াসী। বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ লিনিয়াস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোহান জেকব ডিলেনিয়াসের (১৬৮৪—১৭৪৭ খৃঃ) নাম অনুসারে এই নামকরণ করেছিলেন।

চাঁপা ঃ ফুলের যে কত বিচিত্র মিষ্টি গন্ধ হতে পারে চাঁপা তার একটা বিশেষ উদাহরণ। সংস্কৃত কাব্যে চম্পকের নাম ও খ্যাতি অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাই থেকে মনে হয় খুব প্রাচীন যুগ থেকেই আমরা এই ফুলটি ব্যবহার করতাম। চাঁপা একান্তভাবে ভারতীয় গাছ। চাঁপাগাছের কাঠে সিংহলে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি তৈরী হয়। পাঞ্জাবে চাঁপা-গাছকে বাদশাহী গাছ বলে, সম্ভবতঃ বাদশাহেরা এ গাছটি একান্তভাবে ব্যবহার করতেন বলে। চিরসবুজ গাছ, ঝকঝকে সবুজ পাতা, আমগাছের মত দেখতে, উচ্চতায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট কিংবা তারও বেশী, মাঘ ফাল্গুন মাস থেকে ফুল ফুটতে আরম্ভ হয় আর তা চলতে থাকে সারা গ্রীষ্ম ও বর্ষা পর্যন্ত। চাঁপাগাছ আমাদের বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সম্পদ, এর রূপ ও বৈচিত্র্যময় গন্ধ পল্লীবাংলার রূপকে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে। চাঁপা ফুলের নির্যাস অনেকটা ইলাং ইলাং বা মাকাসার তেলের

চাঁপা

গন্ধের মত, এই মাকাসার তৈল পাওয়া যায় অবশ্য আর একটি গাছের ফুল থেকে যার নাম হল কাননগো ওডোরাটা।

চাঁপা কাঠ নরম কিন্তু টেঁকসই, দামী আসবাবপত্র ও নৌকা তৈরীর কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। চাঁপাগাছের ছাল ও ফুল থেকে বাত, বেদনা ও জ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ তৈরী হয়। চাঁপা-গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হল মাইকেলিয়া চম্পক। নামটি দিয়েছিলেন লিনিয়াস ফ্লোরেন্সের খ্যাতনামা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মাইকেলির (১৬৭৯—১৭৩৭) নাম অনুসারে। চাঁপা ম্যাগনেলিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলায় আরো কয়েক রকমের চাঁপা আছে যেমন কাঁঠালি চাঁপা, হিম চাঁপা, জহুরে চাঁপা, হুলে চাঁপা, চিনি চাঁপা, চিনে চাঁপা, ল্যাভেণ্ডার চাঁপা, কাঠ চাঁপা বা গৌর চাঁপা, ভুঁই চাঁপা, দুলাল চাঁপা, সুলতান চাঁপা এবং কনক চাঁপা।

আতা ও নোনা : উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা আজ সকলেই একমত যে আতা ও নোনা বাংলাদেশে প্রচুর ফললেও এই দুইটি গাছ ভারতবর্ষের নয়, এই দুইটি গাছ এসেছে সুদূর আমেরিকা থেকে, অর্থাৎ এদের আদি বাসভূমি হচ্ছে আমেরিকা। গত শতাব্দীতে জর্জ ওয়াট তাঁর বইএ লিখেছিলেন অজন্তার স্থাপত্যের মধ্যেও আতা ও নোনা ফলের চিহ্ন পাওয়া যায়। জেনারেল কানিংহাম মথুরার স্থাপত্যে ও নোনা ফলের আকৃতি দেখেছিলেন, তাই থেকে তিনি প্রতিবাদ তোলেন আতা ও নোনা একান্তভাবে ভারতবর্ষেরই গাছ। যাই হোক, ওয়াট সাহেব শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদতত্ত্ববিদদেরই মত সমর্থন করেছেন। আতার তুলনায় নোনা স্বাদে ও গন্ধে নিকৃষ্ট, এই দুইটি গাছেরই এক গোত্র ও একই গণ (জেনাস্)। লম্বা পাতাওলা মাঝারি আকারের গাছ। আতার ফল পাকে শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ অবধি, নোনা পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে ও বর্ষার প্রথমে। নোনা ও আতা ফলের ওপর অনেকে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন, বিশেষতঃ শিশু ও বৃদ্ধেরা। পাকা আতা গাছে থাকলে পাখীদেরও লক্ষ্যের

বস্তু হয়ে পড়ে, তাই কাঁচা অবস্থায় অনেক সময় আতা পাড়া হয়, নয়ত জাল দিয়ে সমস্ত গাছকে ঢেকে রাখা হয়। আতার শেকড় থেকে জোল্লাপ তৈরী হয়, আতার পাতা হিষ্টিরিয়া ও আলসারের প্রতিষেধক। এর বীজে এক রকম বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। আতা ও নোনার বীজ ও কাঁচা ফলে কীটনাশক গুণ আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে আতা ও নোনার নাম হচ্ছে এনোনা স্কোয়ামোসা ও এনোনা রেটিকিউলেটা, এরা একই এনোনেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।
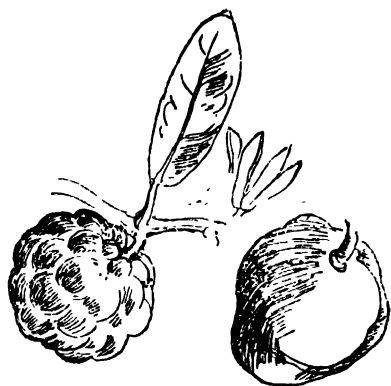
আতা ও নোনা

দেবদারু: আতা ও নোনা গোত্রের আর একটি গাছ দেবদারু। ঋজু, দীর্ঘ গঠন, ঢেউখেলান কিনারাযুক্ত পাতা, গভীর সবুজ রং দেবদারুকে একই সঙ্গে গাম্ভীর্য ও সুষমা দান করেছে। বাংলাদেশের সকল আনন্দ উৎসবে দেবদারুর সাদর আমন্ত্রণ—সদর সাজাবার। দক্ষিণ ভারতে বিবাহোৎসবে দেবদারুর ব্যবহার একটি লৌকিক প্রথা, মালয়-দেশে মৃতের শ্মশানযাত্রায়ও দেবদারুর দরকার হয়। হিমালয়ের অঞ্চলের দেওদারের (Cedrus deodara) সঙ্গে দেবদারুর আকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু হিমালয়ের দেওদারের সঙ্গে সমতলের দেবদারুর কোন নিকট আত্মীয়তা নেই। দেওদার নগ্নবীজ শ্রেণীর গাছ (Gymnosperm) আর দেবদারু আবৃত বীজ শ্রেণীর অন্তর্গত (Angiosperm)। এই গাছটির আদি বাসভূমি সিংহলে কিন্তু ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই গাছটি দেখা যায়। মাঘ ফাল্গুন মাসে দেবদারুর ফুল ফোটে। ঘন সবুজ পাতার আড়ালে সে ফুল থাকে লুকানো। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে দেবদারুর নাম পলিয়ালথিয়া লংগিফোলিয়া।

দুই

ইটের পরে ইঁট দিয়ে গড়া মুখর নগরীর কোলে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম রূপে শ্যামল শ্রীমণ্ডিত, দিগন্ত বিস্তৃত ময়দানটি আমাদের কলকাতা শহরের এক পরম গর্বের বস্তু, ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরের এই সম্পদ নেই। অনেক চেনা অচেনা গাছ এখানে আছে পথের দুপাশে, অথবা মাঠের মাঝে মাঝে, বর্ণোজ্জ্বল সৌন্দর্য ও সুগভীর ছায়া মেলে। বেন্‌থল সাহেব লিখেছেন বাংলা দেশের গাছ চিনতে হলে গড়ের মাঠে একবার আসা দরকার। গড়ের মাঠের যদিও আজ আর সেদিন নেই তবু আমাদের দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক গাছই এখানে পাওয়া যাবে। কিছু কিছু বিদেশী গাছও আছে, ইংরাজ আমলে সযত্নে তাদের এখানে রোপণ করা হয়েছিল, গত দেড়শ বছরের চেষ্টায় তারা এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এদের মধ্যে কয়েক জাতের ক্যাসিয়া, অ্যাকাসিয়া, স্প্যানিস্ মেহগিনি, বিলাতী শিরীষ (এণ্টেরোলোবিয়াম সামান) প্রভৃতি গাছ বিশেষ করে নাম করবার মত।

ভারতবর্ষের যে দুটি গাছ ঐতিহ্যের গভীরতায়, আয়তনের বিশালতায় এবং সংখ্যার গরিষ্ঠতায় সবার প্রথমে দাঁড়িয়ে আছে সেই বট ও অশ্বত্থের চমৎকার সমাবেশ দেখা যায় এখানে। যেখানে রসের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই সেই শহরের ভাঙ্গা পাঁচিলে অথবা জীর্ণ বাড়ীর কার্নিসে অশ্বত্থের আস্ফালন দেখতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু সুযোগ পেলে এরা পরিবেশকে যে কতো আকর্ষণীয় করে তোলে তা অনুভব করা যায় এখানে এলে।

বট ও অশ্বত্থের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সবুজ আলোছায়ার কুহেলী রচনা করে আছে এখানে দেবদারু, কনক চাঁপা, শিমুল, শিশু

জংলী বাদাম, নিম, নিশিন্দা, হিজল, তুন, সেগুন, কুসুম, পলাশ, শিরীষ, গুলমোহর, কর্ণিকার, হরীতকী, অর্জুন, বয়ড়া, জিয়ল, আম, নানা জাতের বাবলা, ঘূর্ণিফল, কালকাসুন্দা প্রভৃতি গাছ। পৃথিবীর অন্যান্য শহরের মত কলকাতার গড়ের মাঠের গাছগুলির গায়ে ল্যাটিন নাম ও সেই সঙ্গে বাংলা নাম লেখা থাকলে তাদের কৌলীন্য রক্ষা হত, সকলের চিনতেও সুবিধা হত। বাংলা নাম না থাকলে নূতন নাম চয়ন করাও যেতে পারে, এটি বিজ্ঞানসম্মত প্রথাই, রবীন্দ্র-নাথই এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তিনি একটি বিদেশী লতার নাম দিয়েছিলেন নীলমণি লতা।

মাঠ ছেড়ে হাটে এলে সবচেয়ে যে অভাবটি সংবেদনশীল মানুষের চেতনাকে পীড়িত করে তোলে তা হল সবুজের অপ্রতুলতা। কল-কাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল বাদ দিলে সমস্ত শহরটিই আজ ধীরে ধীরে এক জনাকীর্ণ বাজারের রূপ নিতে চলেছে। শৃঙ্খলাহীন, সৌন্দর্যবিহীন সমৃদ্ধি, রুচির দৈন্য ও নিষ্করুণ উপেক্ষার অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট পথ-ঘাটগুলিতে যে কয়টি হতশ্রী উদ্ভিদ আজও টিঁকে আছে সেগুলি সেখানে না থাকলেই যেন ভাল দেখাত। শহরের এই ক্রম-বর্ধমান, স্থূল, নিরাভরণ, নীরসতা সবুজ ময়দানেরও কিছু অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে; আর সেই সঙ্গে মুছে ফেলছে শহরবাসী নর-নারীর মনদিগন্তের রং এবং তাদের ক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত দেহ ও মনের শ্রান্তি অপনোদনের মাধ্যম।

ইংরাজ আমলে রাস্তার দুপাশে লাগাবার জন্য গাছের আয়ু, ছায়াদানের ক্ষমতা ও বৃদ্ধির সীমাটাই ছিল বড় প্রশ্ন। ফুলের বাহার ছিল একটি গৌণ প্রশ্ন। আধুনিক কলকাতার রাস্তা-ঘাটে বকুল, জারুল, পলাশ-পিঁপুল, সুলতান চাঁপা প্রভৃতি বাহারি ফুলের গাছ বেশ কিছু সংখ্যায় দেখা যায়। মনে হয় ছায়া প্রদানের সামর্থ্যের থেকে এদের ফুলের সৌন্দর্য ও সীমিত বৃদ্ধির কথাই বিশেষ করে বিবেচনা করা হয়েছে। পুরানো কলকাতার কয়েকটি গাছ নূতনের দলে বড় একটা আর দেখা যায় না। বরুণ, নাগলিঙ্গম

(কুরুপিটা গুয়ানেনসিস্), ছাতিম, কদম্ব প্রভৃতি গাছের ব্যবহার ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে শহরের পথে ঘাটে। একটি বরুণগাছ আছে রাজ্যপালিকার বাড়ির সামনে, ছুটি নাগলিঙ্গম্ গাছ আছে ধর্মতলা ট্রাম টারমিনাসের মধ্যে ও ইডেন গার্ডেনে, এই নাগলিঙ্গমের পাতা ও ফুলগুলি বড় সুন্দর দেখতে, কাণ্ডের দেহ ফুঁড়ে ফুলের স্তবক বেরয়, ফুলগুলি অতি বিচিত্র দেখতে।

শহর ছেড়ে শহরতলির মধ্যে এলে আরও হতাশ হতে হয়। শহরতলিতে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের জন্য বৃক্ষের সুষম ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত বললেই সত্য কথা বলা হয়। কিছু ব্যবহার্য ফল ও ফুলের গাছ এবং এলোমেলো ভাবে বেড়ে ওঠা আকন্দ, আসশেওড়া, আয়াপান, বৈঁচি, ভেরাণ্ডা, তেলাকুচা, রক্তদ্রোণ, কচুরিপানা সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। শহরতলি ছেড়ে বরং আরো দূরে গেলে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে বড় বড় ফলের বাগান, নারিকেলের সারি ঘেরা দীঘি, বিরাট বাঁশঝাড়, শাল ও পলাশের ছায়া ঘেরা স্বাভাবিক তারুণ্যের শান্তশ্রী নজরে পড়ে।

বাংলা দেশের গাছপালার রূপ ও বৈশিষ্ট্য অঞ্চল বিশেষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমতল ছেড়ে উত্তরে দার্জিলিঙ পাহাড়ে উঠলে সেড্রাস, পাইন, থুজা, অরোকেরিয়া, রডোডেনড্রন, লাইকোপোডিয়াম ও অর্কিডের বিচিত্র বাহার আমাদের মন হরণ করে; আবার সুদূর দক্ষিণে সমুদ্রঘেরা সুন্দরবনের গাছপালার বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখে আমরা চমৎকৃত হই। শোনা যায় সুন্দরবনের নাম হয়েছে এই বনে অনেক সুন্দরী গাছ আছে বলে। সুন্দরী গাছ ছাড়াও এই বনে গড়ান, খামো, গোলপাতা, গড়িয়া, হালসী প্রভৃতি গাছ প্রচুর দেখা যায়। লোনা জমিতে বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক প্রবণতা এই সব গাছের যথেষ্ট আছে। নিঃশ্বাস নেবার সুবিধার জন্য এদের অনেকের শিকড়ের প্রান্তগুলি মাটির ওপর জেগে থাকে কাঠের ছোট ছোট খোঁটার মত, যার মধ্য দিয়ে পথচলা অনেক সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে। জলপূর্ণ লোনা জমিতে বংশধরদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করবার জন্য

গড়ান, খামো প্রভৃতি গাছের বীজ গাছে থাকতেই অঙ্কুরিত হয়, তারপর সেই পরিণত চারা গাছটি মাতৃদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরাসরি মাটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুন্দরী গাছের ইংরাজী নাম লুকিংগ্লাস ট্রি, সুন্দরী গাছের পাতার তলায় ছোট ছোট সুন্দর, চক চকে আঁশ থাকবার জন্য দূর থেকে পাতাগুলি ঝকঝক করে, তাই এই নাম। এই আঁশগুলি পাতা থেকে জলের বাষ্পীভবন হ্রাস করে, চারিদিকে অথৈ জল, তবু দেহের মধ্যে জল ধরে রাখবার জন্য এই সব গাছের আকুলতার অন্ত নেই, মাটির জলে নুনের ভাগ অত্যন্ত বেশী থাকায় পরিমিত জল শোষণ করা খুব কষ্টকর, তাই মরুভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ জীবনের কৃচ্ছ্রতা দেখা যায় এদের জীবনে।

পদ্ম : ভারতের জাতীয় ফুল হিসাবে সম্মান পাবার যদি কোন ফুল থাকে তবে তার নাম পদ্ম। পদ্ম ভারতবর্ষের সৌন্দর্যবোধের দ্যোতক। পদ্মের বর্ণ, সুগন্ধ, দল, মৃণাল সব কিছুই সুন্দর। তাই যা কিছু সুন্দর তাই আমরা পদ্মের সঙ্গে তুলনা করি। সুলক্ষণা সুন্দরী নারীকে বলি পদ্মিনী। কৃতী পুরুষকে জাতীয় সম্মান দিই 'পদ্মভূষণ।' শ্রীরামচন্দ্রের নীল চক্ষু ছিল নীল পদ্মের মত সুন্দর, অকাল বোধনে তিনি একচক্ষু উৎপাটন করে সাজাতে গিয়েছিলেন নীল পদ্মের অর্ঘ্য। পদ্মনাভ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছিল পদ্মযোনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনায় পদ্মের সৃষ্টি হয়েছিল এই রকম একটা ধারণা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়।

পদ্ম

আমাদের একটি পুরাণের নাম পদ্মপুরাণ। সংস্কৃত গ্রন্থে শ্বেত পদ্মকে পুণ্ডরীক, লাল পদ্মকে কোকনদ ও নীল পদ্মকে ইন্দীবর বলা হয়।

বাংলাদেশের খালে বিলে, পুকুরে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর পদ্ম জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়, প্রথমটি আসল পদ্ম অন্যটি শাপলা বা শালুক। পদ্মের বৃন্ত যার নাম মৃণাল বা নাল তা অতি দীর্ঘ আর ফাঁপা, সেগুলি পুকুরের তলায় কন্দের সঙ্গে জোড়া থাকে। পদ্মের বীজ অনেকে খায়। পদ্মমধু চোখের পক্ষে উপকারী। শাপলা বা শালুক কৌলীন্যে হীন হলেও আমাদের দেশের কবিরা শালুকের সৌন্দর্য বর্ণনায় কোনদিন কার্পণ্য করেননি। তাঁরা বিমুগ্ধ চিত্তে লক্ষ্য করেছিলেন কোমল চাঁদের আলোর স্পর্শে কুমুদিনী দল মেলে কেমন হেসে ওঠে, আবার প্রখর সূর্যের আলোর স্পর্শে কেমন কুণ্ঠিত হয়ে দল গুটিয়ে নেয়। তাই চন্দ্রের আর একটি নামই দিয়েছিলেন কুমুদনাথ। আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্র চন্দ্রাহত কুমুদিনীর এই নিশি জাগরণের বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন।

পদ্ম একান্তভাবে ভারতবর্ষের উদ্ভিদ হলেও ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় কিছু কিছু পদ্ম পাওয়া যায়। ইউরোপে পদ্মের আধিপত্য খুবই সীমিত।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্মবীজের আয়ুষ্কাল নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে কয়েকজন জাপানী বৈজ্ঞানিক প্রথমে বলেন যে তাঁরা দেখেছেন প্রায় দশ-বিশ হাজার বছরের পুরানো, মাটির তলায় চাপা পড়া পদ্মের বীজ আবার জল, বায়ু ও উত্তাপের স্পর্শে অঙ্কুরিত হতে পারে। সেদিন অনেকেই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়া হ্রদের তলা থেকে ৪০-৫০ হাজার বছরের পুরানো কয়েকটি পদ্মবীজ পাওয়া গেছে, বীজের খোসাগুলি একেবারে ফসিলে পরিণত হয়েছিল। এই ফসিলের বৈশিষ্ট্য ও মাটির তলায় অবস্থানের খুঁটিনাটি বিবরণ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা এদের প্রাক্-ঐতিহাসিক বয়স সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তারপর কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে

এই বীজগুলি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল পার্কে এবং ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অঙ্কুরিত করবার চেষ্টা করা হয়। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। প্রায় ৪০-৫০ হাজার বছরের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ করে অবশেষে পদ্মের ভ্রূণ আবার বীজ থেকে বেরিয়ে বিকশিত কিশলয়ে সূর্যের আলো পান করছে।

মনে রাখতে হবে এই ৪০-৫০ হাজার বছর ধরে বীজের মধ্যে ভ্রূণ সম্পূর্ণ জীবিত অবস্থায় ছিল, নইলে এই অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হত না এবং এর জন্য তাকে প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়েছে আর যথেষ্ট পরিমাণ বীজপত্রের খাদ্য জীর্ণ করেছে। কিন্তু কোন্ বিশেষ শক্তির প্রভাবে বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সে এই ৪০-৫০ হাজার বছরের সুদীর্ঘ জীবন লাভ করল সেটা জীব-বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক নূতন চ্যালেঞ্জ হিসাবে আজ দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা শুধু লক্ষ্য করেছেন বীজের খোসাটি পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বাহিরের জল ও বাতাসের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পদ্ম ও শালুকের নাম যথাক্রমে নেলামবিয়াম স্পেসিওসাম ও নিম্‌ফিয়া লোটাস। এরা নিমফিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত।

নিমফিয়েসী গোত্রের আর একটি উদ্ভিদ ভিক্টোরিয়া রিজিয়া। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনেকেই দেখেছেন ভিক্টোরিয়া রিজিয়া। বিরাট ৪-৫ ফুট ব্যাসযুক্ত কিনারা ওল্টানো বারকোশের মত বড় বড় এদের পাতা। এই রাক্ষুসে পদ্মের বাসস্থান হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীতে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে অনেক ব্যর্থতার পর এই ভিক্টোরিয়া রিজিয়া সাফল্যের সঙ্গে সর্বপ্রথম বড় করে তোলা হয়। এর প্রথম ফোটা ফুলটি মহাসমারোহের সঙ্গে রাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়। এই উদ্ভিদটির নাম তাই ভিক্টোরিয়া রিজিয়া বা রয়েল লিলি।

বরুণ ঃ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে আসেন ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারো। তিনি দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে ভারতবর্ষের উদ্ভিদ সম্পদ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। উইলিয়াম রক্সবারোর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের কয়েকটি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে। ক্রেটাভিয়া রক্সবার্গি বা বরুণ গাছ তাদের মধ্যে অন্যতম।

বরুণ আমাদের দেশের একটি বিস্মৃতপ্রায় উদ্ভিদ। বেলপাতার মত তিনটি ফলকবিশিষ্ট পাতা, বাদামী রং-এর পাপড়ি আর রঙিন পুংকেশর বরুণের সৌন্দর্যের উৎস। শীতের সময় বরুণের সকল পাতা ঝরে যায়, বসন্তে আবার নূতন পাতার শ্যামল সজ্জায় তারুণ্য ফিরে পায়। বরুণের ফুল যখন ফোটে তখন তার পাপড়ির রং থাকে তুষারের মত সাদা কিন্তু পরে তাতে ফিকে বাদামী রং ধরে। বরুণ ফুলের চারটে পাপড়ি। ফুলের আর একটি বিশেষ অংশ আছে যার নাম গাইনোফোর, এটি বরুণ গাত্রের বৈশিষ্ট্য। বেলের মত বড় বড় ফল হয়। বেলগাছের মত পাতা আর ফল দেখে অনেকে বরুণগাছকে বেলগাছ মনে করে ভুল করেন। কলকাতার আশেপাশে কয়েকটি বরুণ গাছ আছে। এর ছাল ও পাতা থেকে কয়েকটি বিশেষ রোগের প্রতিষেধক ঔষধ তৈরী হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বরুণের রোগ-প্রতিষেধক গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

বরুণ

বরুণ ক্যাপারিডেসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের আরও দুটি আগাছা হুর-হুরে ও শ্বেত হুর-হুরে কলকাতার আশেপাশে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

গুলঞ্চ : গুলঞ্চ লতা বাংলাদেশের আজ এক বিস্মৃতপ্রায় উদ্ভিদলতা। কিন্তু আগে আমাদের দেশে গুলঞ্চের গুণের সমাদর যথেষ্টই ছিল। চক্রদত্ত তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থে গুলঞ্চের ভেষজ গুণাবলীর ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। গুলঞ্চের রস টনিক হিসাবে এবং বাত ও অন্যান্য ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত ছিল। ওয়াট সাহেবের Dictionary of the Economic products of India থেকে জানা যায় গত শতাব্দীতে যথেষ্ট পরিমাণে গুলঞ্চ লতা আমাদের দেশ থেকে বিদেশে চালান দেওয়া হত।

গুলঞ্চ লতাজাতীয় গাছ। এর ডালগুলি লতিয়ে লতিয়ে অন্য গাছের ওপর উঠে, কিংবা নিজেরাই পরস্পর জড়াজড়ি করে লতিয়ে লতিয়ে বড় হয়ে উঠে। গুলঞ্চের পাতা হরতনের আকারের, ছয়টি পাপড়িওলা ছোট ছোট ফুল স্তবকে স্তবকে অজস্র ফোটে, দেখতে সুন্দরই। এর কাণ্ডের নালিকাগুলি বেশ বড়, খালি চোখেই দেখা যায়। গত শতাব্দীতে দেওয়ান রামকমল সেন গুলঞ্চ থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রস নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তা ছাড়া বিখ্যাতসার্জন আর. এল. দত্ত, সার্জন আনন্দচন্দ্র মুখার্জি, সার্জন এফ. এফ. মূলার ও সিভিল সার্জন জি. সি. রস এবং এঁদের সমসাময়িক আরও অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় চিকিৎসক রোগ নিরাময়ে গুলঞ্চের বিস্ময়কর গুণাবলীর প্রশংসা করে গিয়েছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গুলঞ্চের নাম টিনোস্পোরা কর্ডিফোলিয়া। এরা মেনিসপারমেসী গোত্রের অন্তর্গত।

গুলঞ্চ

লটকান : লটকানের আদি বাসভূমি আমেরিকা, আমাদের দেশের জলবায়ুর সঙ্গে এই গাছটি এখন বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু লটকান গাছ দেখা যায়, কিন্তু পূর্বের তুলনায় এই গাছটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। লটকানের বীজের ওপরকার শাঁস থেকে একরকম দামী রং পাওয়া যায়, লটকানের আদর এর জন্যই।

মাঝারি আকারের গাছ, লম্বা আকারের পাতা, সারা বছর গাছকে সবুজ করে রাখে। গাছ বিশেষে সাদা, গোলাপী বা লাল রং-এর ফুল অজস্র ফোটে শাখার প্রান্তে থোকায় থোকায়। বাগানের বাহারি গাছ হিসাবেও লটকানের ব্যবহার প্রচলিত। কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণতঃ লটকানের ফুল ফোটে, সময় সময় গ্রীষ্মকালেও ফোটে। ফুলের পাঁচটি করে পাপড়ি ও বৃত্যংশ, পুং কেশরের সংখ্যা অসংখ্য। লটকানের ফলগুলি ছোট ছোট নরম কাঁটায় ঢাকা —কাঁকরোলের পিঠের মত।

লটকান

বীজের ওপরকার শুকনো শাঁস গরম জলে সিদ্ধ করলে গাঢ় লাল রং বেরিয়ে আসে। রংটির কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই শরীরের ওপর; তাই মিষ্টান্ন, মাখন ও নানা রকম খাবারের রং হিসাবে তা ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রশিল্পেও এই রংটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশ থেকে পূর্বে এই রংটি যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানী হত। প্রাচীন যুগে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানেরা এই রংটি গায়ে মেখে যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হত। পাতা, শিকড়, বীজ

ও ছালের ভেষজ গুণাবলীর জন্যও লটকান গাছের খ্যাতি আছে।

লটকান গাছ আমাদের দেশের অন্যতম সম্পদ, এর ক্রমক্ষীয়মাণ জনপ্রিয়তা সত্যই অনুতাপের বিষয়। এই বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। লটকানের বৈজ্ঞানিক নাম বিক্সা ওলেরেণা। এরা বিক্সেসী গোত্রের অন্তর্গত।

বৈঁচিঃ বাংলাদেশের এক অনাদৃত আগাছা, কলকাতার আশে-পাশে বৈঁচি গাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। সুতীক্ষ্ণ কাঁটা, ছোট ছোট সবুজ পাতা আর ছোট ছোট একলিঙ্গ ফুল বৈঁচির বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ অংশ একটি ফুলের মধ্যেই থাকে, বৈঁচির ফুল তার ব্যতিক্রম; এর ফুলগুলি শুধু একলিঙ্গ নয় গাছগুলিও একলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটে সম্পূর্ণ দুটি স্বতন্ত্র গাছে। বসন্তকালে বৈঁচির ফুল ফোটে, ফুলগুলি আকারে খুবই ছোট, কোন পাপড়ি নেই, কতকগুলি বৃত্যাংশ আছে। বেড়া দেওয়ার কাজে বৈঁচির ব্যবহার প্রচলিত। এর কাঠ জ্বালানি ছাড়া আর কোন কাজেই লাগে না। এর ছাল বাতের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বৈঁচি গাছ ভারতের সর্বত্র এবং সিংহল ও মালয় দেশে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বৈঁচির নাম ফ্ল্যাকুরটিয়া র‍্যামনোচি। এরা ফ্ল্যাকরটিয়াসী গোত্রের অন্তর্গত। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জেনারেল ডিরেক্টর ই দ্য ফ্লাকুর-এর নাম অনুসারে এই নামটি দেওয়া হয়েছে।

তিন

"ওগো মহাশাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসঙ্গীতে
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি ; যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি-পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি।"

অভ্রভেদী সুষমা ও আত্মসমাহিত প্রশান্তির প্রতীক শালবীথিকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একদিন এই লাইনগুলি লিখেছিলেন। আমাদের দেশের প্রকৃতির নিজস্ব রূপটি ফুটে ওঠে শালবীথির রূপের বৈশিষ্ট্যে,—ইউরোপের প্রকৃতির রূপকে যেমন ফোটায় ম্যাপল, বার্চ, পাইন ও পপলারের দল। ইউরোপের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রকৃতি বর্ণে ও গন্ধে আরো বৈচিত্র্যময়। ইউরোপের বসন্তে বর্ণের সমারোহ আছে কিন্তু গন্ধের আবেশ বিলীয়মান আর শীতের রিক্ত দিগন্তে সে বর্ণের সমারোহ সীমিত।—তবু সে দেশে প্রকৃতিকে গ্রহণ করবার জন্য আয়োজনের অন্ত নেই। মানুষের জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্যের প্রয়োজন আছে। বিশেষজ্ঞরা একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেন, মায়ের স্নেহের ছায়ায় শিশুর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি মানুষের জীবনেও মমতা, সহিষ্ণুতা, সারল্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ও রসবোধ গড়ে ওঠে প্রকৃতির সরস ও স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শে। বন্যদের মধ্যে সারল্যের অভাব তাই কোন দিনই ঘটে নি। ব্রাজিলের একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ নিউইয়র্ক শহরের অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির জন্য সরাসরিভাবে দায়ী করেছিলেন শহরের আকাশচুম্বী বাড়িগুলিকে। সাহিত্য ও কাব্যের মাধ্যমে

প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমরা উপলব্ধি করে আসছি। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শালবীথির তলায় কোন কিশোর কবিবন্ধুর সঙ্গে একদা কাব্য-চর্চা করে আনন্দ পেতেন, তারপর সেই কিশোর বন্ধুটি অকালে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান,—কবি সেই ব্যথা শালবীথিকেই নিবেদন করেছিলেন, শালবীথির ছায়ায় তার মনে বহুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের ছায়া পড়েছিল। উপরের কবিতার লাইনগুলি সেই ভাবনারই বাহক।

শাল

শালের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। এরা যদি মাটি ও আবহাওয়ার আনুকূল্য পায় তাহলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ধীরে ধীরে এক অরণ্য গড়ে তোলে। যেগুলি আমাদের দেশের নিজস্ব গাছ, আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে যাদের বাহির ও অন্তরের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেই সব গাছের বৈশিষ্ট্যই এই। সারি সারি শাল গাছ, লাল শক্ত মাটি, শুকনো বাতাস,—বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলের, বিশেষতঃ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূমের চেহারাই এই। আসাম, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে যথেষ্ট শালগাছ আছে। শিলিগুড়ির শালের যথেষ্ট খ্যাতিও আছে।

শালের সংস্কৃত নাম অশ্বকর্ণ। হিন্দী নাম দামার। ওড়িয়াতে বলে শেকওয়া। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে ও বৌদ্ধগ্রন্থে শালগাছের

প্রশংসা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের নিজের জীবনের সঙ্গে যে দুটি গাছের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি হল শাল অন্যটি অশ্বত্থ। কথিত আছে বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর মায়ের হাতে শালগাছের একটি শাখা ছিল,—কেউ কেউ বলেন সেটি অশ্বত্থগাছের। বুদ্ধদেব তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ রাত্রি অতিবাহিত করেন একটি শালগাছের তলায়। সাধারণ বাঙালীর জীবনে যে দুটি গাছের পাতা খুব বেশী কাজে লাগে তারও একটি হল শালের অন্যটি অবশ্য কলার। শালবন থেকে রাশি রাশি সবুজপাতা চালান দেওয়া হয় শহরে এবং তারপর আসে গৃহস্থের ঘরে ময়রার দোকানের মারফত। সাঁওতালরা শালপাতার বড় বড় বিড়ি তৈরি করে ধূমপান করে। তবে আসল বিড়ি তৈরি হয় শালপাতা থেকে নয়—তা হয় গাবজাতীয় একটি গাছের পাতা থেকে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে যার নাম হল ডাইয়সপাইরস মেলানোক্সাইলন, হিন্দীতে বলে তেন্দু পাতা, ওড়িয়াতে বলে কেন্দু পাতা, বাঙলাতে তার কোন বিশেষ নাম নেই, তবে বাজারে বিড়িপাতা এই নামেই চলে। হিমাচল প্রদেশে প্রচুর হয়, প্রধানতঃ সেইখান থেকেই চালান আসে।

শালগাছে সব সময়ই পাতা থাকে শুধু ফাল্গুন মাস ছাড়া। ছোট শালগাছের ছাল মসৃণ, বড় গাছের ছাল কর্কশ, ফাটা-ফাটা। বসন্তে ফুল ফোটে শালের। অজস্র ফিকে পীতবর্ণ ফুলের ঝাড়ে গাছ ভরে ওঠে। গরমকালে শালের ফল দেখা দেয়। ফলের পাঁচটি পাখনা আছে, ফুলের বৃত্যংশগুলিই পাখনায় রূপান্তরিত হয় এবং বীজের বিস্তারে সহায়তা করে।

শালের কাঠ বেশ ভারী আর মজবুত। কাঠের রস শুকোতে বেশ দেরী হয়, কাঠের ওপরটা শুকিয়ে গেলেও ভেতর ভিজে থাকে, এই জন্য শাল কাঠ রৌদ্রে তাড়াতাড়ি শুকোবার সময় বেঁকে যায়। শাল কাঠের গুঁড়িতে খুঁটি, রেলের স্লিপার, চাষের জমির জন্য জল তোলার যন্ত্র, কড়ি, বরগা ইত্যাদি তৈরি হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন বর্ষার সময় রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে যায়, তখন কাষ্ঠের জঙ্গল থেকে

শালের বড় বড় গুঁড়ি কেটে পাশাপাশি সাজিয়ে সাময়িকভাবে রাস্তা তৈরি করে নেওয়া হয়। গুঁড়ির মধ্যকার পীতবর্ণের কাঠ (হার্ট উড্) খুব মজবুত ও টেঁকসই, কিন্তু চারপাশের সাদা অংশ (স্যপ উড) তত মজবুত বা টেঁকসই নয়। খুব প্রাচীনকাল থেকেই আমরা শাল কাঠ ব্যবহার করে আসছি। ভারতের অনেক পুরানো দেব-দেবীর মন্দিরে শাল কাঠের কাজ দেখা যায়।

শালগাছ থেকে আর একটি মূল্যবান জিনিষ পাওয়া যায় তা হল শালের ধুনা। শালগাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে সামান্য চিরে রাখলে সেই চেরা অংশে গাছের একরকম গাঢ় আঠা এসে জমা হয়, এই জমা আঠাই বাজারে ধুনা হিসাবে বিক্রি হয়। পাইন প্রভৃতি গাছ থেকেও ধুনা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন পাইন ও শালের ধুনা একই রকম গুণসম্পন্ন। সাধারণতঃ বছরে তিনবার—জুলাই, অক্টোবর ও জানুয়ারীতে শালগাছ থেকে ধুনা বার করা হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শালের ধুনা রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়। শালের নাম সোরিয়া রোবাস্টা—এরা ডিপটেরো-কারপেসী গোত্রের অন্তর্গত। বিখ্যাত গর্জন ও মোহালগাছ শাল-গাছের সমগোত্রীয়।

জবা : সংস্কৃতে জবার আর এক নাম রুদ্র-পুষ্পম। রুদ্রাণীর পূজা রক্তজবা ছাড়া আর অন্য কোন ফুলে হয় না। যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে শাক্তেরা এই নিয়ম মেনে আসছেন। জবাফুলের টকটকে লাল রং মানুষ ছাড়াও পশুদেরও উত্তেজিত করে তোলে। আমাদের রাঢ়ভূমিতে আগে ডাকাতরা জবাফুলের মালা গলায় পরে ডাকাতি করতে বেরত, তারা কানের পাশেও সময় সময় জবাফুল গুঁজে রাখত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা সন্দেহ করেন জবাগাছ ঠিক আমাদের দেশের গাছ নয়,—এই গাছটি এসেছে সুদূর চীনদেশ থেকে, জবা গাছের নাম তাঁরা তাই রেখেছেন হিবিসকাস রোজা চাইনেনসীস্ অর্থাৎ চীন দেশের

গোলাপ। নামটি দিয়েছেন আধুনিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গুরু স্বয়ং লিনিয়াস্।

পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল আমাদের দেশে জবাগাছ বীজ থেকে হয় না, ডাল পুঁতেই এর বংশবিস্তার হয়, কিন্তু পরলোকগত খ্যাতনামা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার দেখিয়েছেন ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে জবাগাছ বীজ থেকেও হয়। রক্তজবা ছাড়া সাদা, হলুদে, ম্যাজেন্টা ও দু-মিশালি রং-এর জবাও পাওয়া যায়, তাছাড়া সিঙ্গল, ডবল ও ঝুমকা,—এ-সব ধরণের জবাও হয়। বাগানের বাহারি গাছ হিসাবে জবার খ্যাতি যথেষ্ট। বারমাসই ফুল হয়, তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বেশী ফুল ফোটে। রক্সবারো সাহেব লিখেছেন, জবাফুলের পাপড়ি থেকে এক রকম রং পাওয়া যায়, চীনদেশে জুতোর রং কাল করা হয় তাই দিয়ে। জবাফুলের ইংরাজী নাম তাই সু-ফ্লাওয়ার। চুলের কলপ হিসাবেও এই রং চীনারা ব্যবহার করে। আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘিয়ে পাক করা জবা ফুল স্ত্রীরোগের অমোঘ ঔষধ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

জবা

জবাফুল ফিলিপাইন ও চীনদেশের লোকেরা রান্না করে খায়। তারা জবাফুলের উপাদেয় চাটনী আর বেসন দিয়ে জবাফুলের বেগুনীর মত খাবার তৈরী করে। কয়েক বছর আগে ফিলিপাইনের একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় জবাফুলের খাদ্যগুণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকে জানা যায়, জবাফুলের আছে জলীয় অংশ ৮৯ শতাংশ, নাইট্রোজেন ০.০৬৪ শতাংশ, স্নেহজাতীয় পদার্থ ০.৩৬ শতাংশ এবং প্রতি ১০০ গ্রাম ফুলে চুণ আছে ৪.০৪, ও ফস্‌ফরাস্ ২৬.৬৪, লৌহ ১.৬১ থিয়ামিন ০.০৩১, রিবোফ্ল্যাবিন ০.০৪৮, নিয়াসিন ০.৬১, অ্যাসকরবিক এ্যাসিড ৪.১৬

মিলিগ্রাম। জবাগাছ ম্যালভেসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের অন্যান্য পরিচিত গাছ হল কার্পাস তুলা, মেস্তা পাট, স্থলপদ্ম, পরাশ-পিঁপুল, বাওবাব, বেড়েলা, বনওকড়া, শিমুল ও ঢেঁড়স।

ওলট কম্বল: বাংলাদেশে, আসামে ও উত্তরপ্রদেশে ওলট কম্বলের গাছ বন-জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়। এর পাতা ও ফুলের অপূর্ব বাহারের জন্য অনেকে এই গাছ বাগানেও রোপণ করেন। প্রায় একশ বছর আগে ওলট কম্বলের গাছ আমাদের দেশে চমকের সৃষ্টি করেছিল। ওলট কম্বলের ছাল থেকে পাটের মত মসৃণ আর শক্ত একরকম আঁশ পাওয়া যায়। বিদেশী উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা এই আঁশের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁরা সেদিন বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে পাটের বাজার একদিন ওলট কম্বল দখল করবে। কিন্তু তাঁদের সে আশা বাস্তবে পরিণত হয় নি, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এক একর জমিতে যেখানে ২৫।৩০ মণ পাট পাওয়া যায়, সেখানে ওলট কম্বলের আঁশ উৎপন্ন হয় মাত্র দু মণ-আড়াই মণ। এই স্বল্প উৎপাদন ও অত্যধিক পড়তা খরচাই ওলট কম্বলকে হটিয়ে দিয়েছে পাটের বাজার থেকে।

সাধারণের কাছে ওলট কম্বলের নাম আজ বিস্মৃত প্রায়। আট দশ ফুট লম্বা গাছ। বর্ষার শেষে ফুল ফোটে, শীতের সময় ফল হয়। ফুলের পাঁচটি পাপড়ি, রং বেগুনী, ঘণ্টার মত কয়েকটি ফুল শাখার প্রান্তে দোলে, সুন্দরই দেখতে।

ওলট কম্বলের শিকড়ের ছাল স্ত্রী-রোগের ভাল ঔষধ। পুরানো দলিল পত্র থেকে জানা যায়, বাবু ভুবনমোহন সরকার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে এই গাছের ভেষজ গুণাবলী সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই সময় পাবনার বিখ্যাত সার্জন আর. এল. দত্ত, এম-ডি, ও কলকাতার এ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জন বাবু বলাইচাঁদ সেন এই গাছের শিকড়ের ছালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। ওলট কম্বলের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাব্রোমা

আগাষ্টা এরা ষ্টারকুলিয়াসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের অন্যান্য গাছ হল—আঁতমোরা, মুচকুন্দ চাঁপা এবং সুন্দরবনের বিখ্যাত সুন্দরীগাছ।

কনকচাঁপা : সুউচ্চ চিরহরিৎ বৃক্ষ। পাতার আকার প্রায় গোল, কিনারা সামান্য ঢেউ খেলানো, পাতার ওপরের পিঠ সবুজ, তলাটা ধূসর। বৃষ্টির সময় এই ধূসর রংটি বেশ ফুটে ওঠে, তাই অনেক গাছের মাঝেও কনকচাঁপাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

কনকচাঁপা

বসন্তের প্রথম থেকেই কনকচাঁপার ফুল ফুটতে সুরু হয়। লম্বা লম্বা ফুল পুরু পাঁচটি বৃত্যংশ ও পাতলা পাঁচটি পাপড়ি। পাপড়িগুলি প্রথমে থাকে সাদা, পরে তা বদলে যায় চাঁপা রং-এ। বৃত্যংশের গায়ে আছে অজস্র ছোট ছোট গ্রন্থি, কনকচাঁপার সুগন্ধ এই গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের জন্যই। বাসি কনকচাঁপার ফুলেও এই সুগন্ধ থাকে। আমাদের দেশে গ্রামের ছেলেরা বসন্তের ভোরে উঠে মাঠে গিয়ে কুড়িয়ে আনে রাশি রাশি কনকচাঁপার ফুল, বালিসের তলায় রেখে দেয়, ছারপোকা দূর করবার জন্য। কনকচাঁপার ফল পাকতে প্রায় এক বছর লাগে। গাছেই ফল পাকে, গাছেই ফল ফাটে আর প্রচুর পাখনাওলা বীজ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। কনকচাঁপার ল্যাটিন নাম টেরোসপারমাম অ্যাসিরি-

ফোলিয়াম। গ্রীক ভাষায় টেরোসপারমাম মানে পাখনাওলা বীজ, পাখনা থাকার জন্যই বীজগুলি হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে পড়ে দূরে— বংশবিস্তারের সুবিধা হয়। কনকচাঁপার পাতা ও ফুল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কনকচাঁপা ষ্টারকুলিয়াসী গোত্রের অন্তর্গত।

চার

পৃথিবীতে কত রকমের উদ্ভিদ আছে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীতে উদ্ভিদ আছে প্রায় আড়াই লক্ষ রকমের। এরা শুধু আমাদের পরিচিত প্রতিবেশীরূপে ডাঙ্গার ওপর বাস করে তাই নয়, এদের অনেকে পুকুর ও ঝিলের মিষ্টি জলে এবং সমুদ্রের লোনা জলের মধ্যেও বসবাস করে। তার মধ্যে যাদের ফুল ফোটে, বীজ হয় সেই রকম উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, বাদ-বাকী সব ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা, মস, ফার্ন ইত্যাদি অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ।

স্যার জে. ডি. হুকারের হিসাব থেকে জানা যায় অবিভক্ত ভারতে ধান মটরের মত স-বীজ শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে প্রায় বারো থেকে চৌদ্দ হাজার রকমের। এই বিশাল উদ্ভিদ সম্পদ সত্যই আমাদের দেশের এক প্রধান ঐশ্বর্য।

গাছ কতদিন বাঁচে? কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া বাঁচে মাত্র কয়েকদিন। ধান, গম, মটর প্রভৃতি গাছ একবার ফল প্রসব করেই শুকিয়ে যায়, তাই এদের নাম ওষধি, এদের জীবন মাত্র কয়েক মাসের। অবশ্য কয়েক শ্রেণীর ওষধি আছে যাদের এই একবার ফল ধরতেই কেটে যায় দশ-বিশ বছর বা তারও বেশী। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমাদের দেশের বট, অশ্বত্থ ও আফ্রিকার বাওবাব গাছের পরমায়ু অতি দীর্ঘ। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিরাট বটগাছটির বয়স প্রায় দু'শ বছর। এক হাজার থেকে দু-হাজার

বছর বেঁচে থাকতে পারে এমন আট-দশটি গাছের নাম উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই জুনিপার সেড্রাস বা সাইকাস্ জাতীয় নগ্ন-বীজ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. চেম্বারলেন তাঁর 'দি লিভিং সাইকাড্' গ্রন্থে লিখেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় কয়েকটি কনিফার শ্রেণীর সেকোইয়া (সেকোইয়া জাইগানসিয়া) বৃক্ষ আছে যারা তিন হাজার থেকে চার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। প্রকৃতির এই নীরব সাক্ষীগোপালেরা মৃত্যুকে পরিহাস করে সভ্যতার সূচনা থেকেই টিঁকে রয়েছে আজ অবধি। অনিবার্য ক্ষয় ও স্বাভাবিক মৃতুকে জয় করে ৪০-৫০ হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এমন পদ্মবীজের ভ্রূণের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

শিমুলঃ আমাদের দেশের ক্ষণস্থায়ী বসন্তের সৌন্দর্যকে যারা ফুটিয়ে তোলে রক্ত-শিমুল তাদের মধ্যে অন্যতম। পত্রহীন ডালে বড় বড় রক্ত-রঙিন ফুল, গাছের তলায় ঝরে পড়া অজস্র পাপড়ি, রঙিন কেশরের গুচ্ছ ও বসন্তের আতপ্ত বাতাস,—এর মাঝে রসিক গৌড়জনেরা ঋতুরাজের শোভা উপলব্ধি করে থাকেন।

দীর্ঘ সরল বৃক্ষ, ডালপালাগুলি বৃত্তের আকারে ভূমির প্রায় সমান্তরালে বেড়ে ওঠে। তরুণ গাছের গায়ে মোটা মোটা কাঁটা বর্মের আকারে ঘিরে থাকে। ছালের রং ধূসর। শীতের প্রথম থেকেই শিমুলের পাতা ঝরতে সুরু হয় আর পৌষ, মাঘ মাসে তার ফুল ফোটা আরম্ভ হয়, বসন্তের শেষ অবধি তা চলতে থাকে। শিমুলফুলের পাঁচটি পাপড়ি, রঙ তাদের রক্তবর্ণ, অজস্র রঙিন পুংকেশর, কুঁড়ির রং কালচে লাল।

শিমুলফুলে কোন গন্ধ নেই, তা দিয়ে সম্ভবতঃ কোন দেবতার পূজা হয় না। ফলে কোন স্বাদ নেই, তা দিয়ে মানুষের ক্ষুধার শান্তি হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সম্ভবতঃ এই জন্য শিমুলের

প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। উপেক্ষা ভরে শিমুলের নাম দিয়েছিলেন 'যমদ্রুম'—অর্থাৎ যমালয়ের বৃক্ষ। কথিত আছে যমালয়ে একটি বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে যার সর্বাঙ্গ ভরা কাঁটা, যমরাজ স্বয়ং বিশেষ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের সেই গাছে বেঁধে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

গোঁড়া শাস্ত্রকারের কাছে উপেক্ষিত হলেও শিমুল সত্যই একটি রূপসর্বস্ব, নির্গুণ উদ্ভিদ নয়। শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন অসংখ্য বুলবুল, ময়না, টুনটুনি আর কাকেরা এসে ভীড় জমায় ডালের ওপর; তারা সম্ভবতঃ শিমুলের মিষ্টি মধু অথবা মধু-অন্বেষী নানা জাতের পোকা মাকড়ের লোভেই আসে। শিমুলের ফুল শোনা যায় অনেকে রান্না করেও খায়। শিমুলের ফল পাকে গ্রীষ্মকালে, বীজের সঙ্গে শিমুল তুলা ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। শিমুল তুলা খুব নরম, হাল্কা ও মসৃণ। তা দিয়ে সুতা পাকানো সম্ভব না হলেও লেপ, তোষক ও গদি তৈরির কাজে যথেষ্ট চাহিদা আছে। জাহাজের লাইফ জ্যাকেট তৈরির কাজেও এই তুলার যথেষ্ট

শিমুল

চাহিদা আছে। শিমুলের কাঠ খুব নরম ও হাল্কা, পূর্বে এই কাঠে প্যাকিং বাক্স, চায়ের পেটি ও মৃতের কফিন তৈরি ছাড়া আর

অন্য কোন কাজ হত না। বর্তমানে এই কাঠ ভারতের দেশলাই শিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কাঠই ভারতের দেশলাই শিল্পকে আজ বাঁচিয়ে রেখেছে। দেশলায়ের কাঠি, খোল সবই শিমুল কাঠ থেকে তৈরি হয়। শিমুলের শুকনো আঠাকে মোচারস বলে। গঁদের বদলে এই আঠাটির ব্যবহার প্রচলিত। শিমুলের শেকড়, ফুল ও আঠায় রোগ নিবারক গুণ আছে। শিমুলেরা বোমবাকেসী গোত্রের অন্তর্গত।

ফলসাঃ প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা এককালে ফলসাকে সমাদর করে যথেষ্ট উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা ফলসাকে ত্রিফলের এক ফল হিসাবে গণ্য করতেন। ফলসার সংস্কৃত নাম পরুষ। বাংলাদেশের গ্রামে, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রচুর ফলসা-গাছ জন্মায়। বাংলাদেশ ছাড়াও বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পুণা, অযোধ্যা ও সিংহলে যথেষ্ট ফলসাগাছ দেখা যায়। ফলসার সমাদর অল্পবয়সীদের কাছ ছাড়া সর্বত্র আজ লুপ্তপ্রায়।
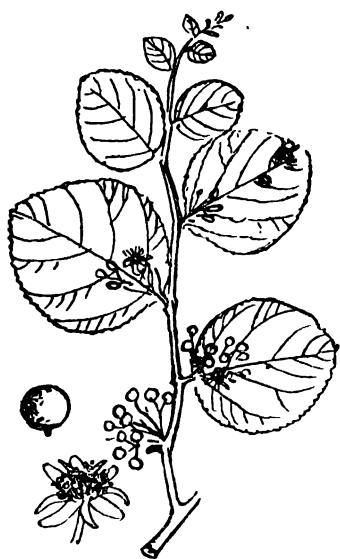
ফলসা

কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু গাছ, ছালের রং ধূসর, পাতা সামান্য লোমযুক্ত, কিনারা খাঁজকাটা। ফলসার ফুল ধরে বসন্তে, ফল-পাকে গ্রীষ্মের প্রথমেই। কবিরাজরা বলেন, ফলসা বেশ ঠাণ্ডা ফল। আগে আমাদের দেশে ফলসার সরবত প্রচলিত ছিল। ফলসা ফল থেকে এক রকম সুরাসার তৈরি হয়। ফলসা গাছের রস শর্করা শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

পুরানো দলিলপত্র থেকে জানা যায় বিগত দশকে রেভারেণ্ড ক্যাম্বেল সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন সাঁওতালরা ফলসাগাছের শিকড়ের ছাল থেকে বাতের ঔষধ তৈরি করে। ফলসার বৈজ্ঞানিক নাম গ্রুইয়া সুবিনাকুয়ালিস্। এরা টিলিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের আর একটি অতি বিখ্যাত এবং আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ হল পাট।

মাধবীলতাঃ সৌন্দর্যময় মাধবী অতি প্রাচীনকাল থেকেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। সংস্কৃতে মাধবীলতার

মাধবীলতা

নাম মাধবিকা বা মাধবী। কালিদাস শকুন্তলার যৌবন-বেদনা বর্ণনার সময় মাধবীলতাকে স্মরণ করেছিলেন। লতাজাতীয় বেশ

বড় গাছ, চাঁপাগাছের মত পাতা, ডালের মধ্যকার অংশ লাল, চারপাশের অংশ ফিকে হলদে। মধুমাসে মাধবী ভরে উঠে ফুলে ফুলে। অনেক সময় শীতের শেষ থেকেই ফুল ফুটতে সুরু হয়, গ্রীষ্মের শেষ অবধি তা চলতে থাকে। গুচ্ছ, গুচ্ছ সাদা রঙের ফুল, অপূর্ব মিষ্টি গন্ধ, পাঁচটি পাঁপড়ি, অসমান। পুং কেশরের সংখ্যা দশটি, একটি সব চাইতে বড়, লম্বা ও বাঁকা। মাধবীর ছাল সৌগন্ধময় অথচ তিক্ত। মাধবীপাতার রসে কীটনাশক গুণ আছে শোনা যায়। পুরাতন বাত ও চর্মরোগে কবিরাজী শাস্ত্রমতে মাধবীপাতার রস ফলপ্রদ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মাধবীলতার নাম হিপটেজ মাধবলতা, কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ হিপটামি থেকে, যার অর্থ হল 'উড়ন্ত'। মাধবীর পাখনাওলা ফলেব জন্য এই নামটি দেওয়া হয়েছে। এরা ম্যালপিজিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত। ইটালীর নামকরা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মার্সেলো ম্যালপিজির (১৬২৮-৯৩) নাম অনুসারে এই গোত্রের নামকরণ হয়েছে।

কামরাঙা: কলকাতার বাজারে আজকাল এই ফলটিকে বড় একটা দেখা যায় না। কলকাতার ছেলেমেয়েরা এই ফলটিকে আজ ভুলতে বসেছে। পিঠে পাঁচটি উঁচু শিরওলা পটলের মত ফল, ফিকে সবুজ রং, অম্ল মধুর স্বাদ, গ্রামের অল্পবয়সীদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কলকাতার আশে পাশে, হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলায় কিছু কিছু কামরাঙা গাছ আছে। ভারতের সর্বত্রই কাম-রাঙা হয়। ছোট গাছ, ছোট পাতা, শক্ত লোমওলা বোঁটা।

কামরাঙা

কামরাঙার পাতা গায়ে লাগলে চুলকায়। সাদা বা লোহিত বর্ণের ফুল। গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় ফুল ফোটে। শরতে ও হেমন্তে কামরাঙার

ফল পাকে। সাধারণতঃ দুই জাতের কামরাঙা দেখা যায়। এক জাতের কামরাঙা বাঘা তেঁতুলের মত স্বাদ,—আর এক জাতের ফল অম্লমধুর, তাকে চিনি কামরাঙা বলে। কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার ছাড়া কামরাঙার চাটনীও বেশ উপাদেয়। গত শতকে শোনা যায় কলকাতার মেমেরা কামরাঙা থেকে জেলি তৈরি করত। ওয়াট সাহেব তাঁর গ্রন্থে কামরাঙার জেলির প্রশংসা করেছেন। কামরাঙা খুব ঠাণ্ডা ফল। কবিরাজেরা কয়েকটি রোগে কামরাঙার ফল ব্যবহার করে থাকেন। কামরাঙার বৈজ্ঞানিক নাম হল ক্যারামবোলা এভেরোয়া, এরা অক্সালিডেসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের আরও কয়েকটি গাছ হল আমরুল, বিলিম্বি, বন-নারঙ্গা ইত্যাদি। আমরুল শাক টক, ঔষধ এবং পথ্য দুই হিসাবেই আমরা তা ব্যবহার করি।

বেল: আমাদের দেশের যে কয়টি উদ্ভিদকে অতি পবিত্রজ্ঞানে দেবতার চরণে উৎসর্গ করা হয় বেল তাদের মধ্যে একটি। সম্ভবত: অশ্বত্থের সঙ্গেই এই বিষয়ে এর তুলনা চলতে পারে। মানুষের উপকারে বেলের ভূমিকা অবশ্য অশ্বত্থের থেকেও বেশী স্পস্ট। হিন্দু পুরাণে ও দর্শনশাস্ত্রে বিল্বপত্র সম্পর্কে অনেক গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। বিল্বপত্রের তিনটি ফলককে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি পত্র-ফলককে অন্যত্র আবার জাগ্রত, সুপ্তি ও স্বপ্ন—এই তিন অবস্থার দ্যোতক ; অথবা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের রূপক হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; কোথাও আবার ত্রিকালদর্শী স্বয়ং শিবের ত্রিনয়নের প্রতীক হিসাবেও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সময় সময় বেলপাতার তিনটি ফলক ছাড়া পাঁচটি ফলকও দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরে যায়, তারপরে কচিপাতায় যখন গাছ ভরে উঠতে থাকে তখন ফুল ধরে। হাল্কা সবুজ আভা ঘেরা ফুল,

পাপড়ি চার পাঁচটি, পুং কেশরের সংখ্যা অসংখ্য। বেল ফুলের বেশ হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আছে। ফুল থেকে যে বেল ফল হয় তা পাকতে অনেক সময় লাগে—প্রায় আট দশ মাস।

কাঁচা বেলের মোরব্বা ও পাকা বেলের সরবত স্বাদে যেমন অতুলনীয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমনি উপকারী। চোখের অসুখেও বেলপাতা উপকারী। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে শুধু ফল নয় বেলের পাতা, ছাল, শিকড়, এমনকি ফুলেরও রোগ প্রতিষেধক গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। গত শতকে বহু স্বদেশী এবং বিদেশী চিকিৎসক শ্রীফলের রোগ-নিরাময় ক্ষমতার প্রশংসা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কলকাতার সার্জন এমারসন, মাদ্রাজের সার্জন পার্কার, চিতোরের সার্জন ল্যাঙ্কাষ্টার, ফরিদপুরের সার্জন ডি. বসু, রাওলপিণ্ডির ভগবান দাস ও ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলের দয়ালচন্দ্র সোমের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেলগাছ থেকে গঁদের মত এক রকম আঠা পাওয়া যায়, বেলের খোলা থেকে একরকম হলদে রঙও পাওয়া যায়, পূর্বকালে বস্ত্রশিল্পে এই রঙের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেলগাছের বৈজ্ঞানিক নাম ইগল মারমেলোস, এরা রুটেসী গোত্রের অন্তর্গত। কদবেলও এই গোত্রের অন্তর্গত। নানারকমের লেবু—পাতি লেবু, কাগচি লেবু, গোঁড়া লেবু, বাতাবি লেবু, কমলা লেবু—এরাও বেল গাছের সমগোত্রীয়। তাছাড়া কামিনীফুল, আসশেওড়া প্রভৃতি কয়েকটি গাছ এই গোত্রের অন্তর্গত।

মেহগিনিঃ ১৭৯৫ সালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে রক্সবারো সাহেবের আমলে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম মেহগিনি গাছের আবাদের চেষ্টা করা হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে মেহগিনির চারা নিয়ে আসা হয়েছিল। মেহগিনি আমাদের দেশের গাছ নয়, খাঁটি মেহগিনির (সোয়েটেনিয়া মেহগিনি) আদি বাসস্থান হচ্ছে জামাইকা ও মধ্য আমেরিকায়। মেহগিনি শব্দটিও হচ্ছে

বিদেশী। মেহগিনির কাঠ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঠ হিসাবে গণ্য করা হয়। কাঠের জাহাজের যখন প্রচলন ছিল তখন স্পেনীয়রা মেহগিনি কাঠের চমৎকার জাহাজ তৈরি করত। প্রায় ১০০ বছরের পুরানো এই রকম একটি যুদ্ধজাহাজ দেখে ইংরাজরা অবাক হয়ে গিয়েছিল,—জাহাজের প্রত্যেকটি কাঠ প্রায় নূতন অবস্থায় ছিল। ইংরাজরা এক সময় ভারতবর্ষে মেহগিনি গাছের আবাদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিবপুরের বাগান ছাড়া দার্জিলিঙ, দেরাদুন, পাঞ্জাব ও আন্দামানে যে আবাদের চেষ্টা করা হয় তা বিশেষ সফল হয় নি। বাংলা দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছিল গাছগুলি। তাদের অনেকগুলিকে আজও দেখা যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কলকাতার রাস্তার দুপাশে এবং গড়ের মাঠেও তাদের কিছু বংশধর দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে দ্বারভাঙ্গা, পালামৌ, দক্ষিণ মালাবার, মাদুরা ও পুণার কিছু কিছু মেহগিনি আছে। চিরহরিৎ বিরাটাকার গাছ, যৌগিক পাতা, বসন্তে নূতন পাতা ধরে, তখন সবথেকে সুন্দর হয় গাছগুলি।
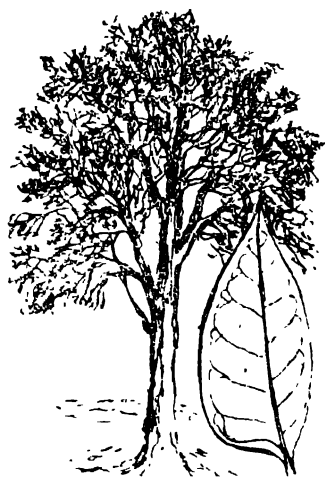
মেহগিনি

বসন্তের শেষে ফিকে সবুজ রঙের ছোট ছোট ফুল অজস্র ফোটে। শক্ত খোসাযুক্ত ফল, অনেকগুলি বীজ থাকে ফলে, বীজ পাখনাযুক্ত। চমৎকার লাল রঙের কাঠ, কাঠের আঁশ বেশ মজবুত।

ভারতের বন বিভাগের প্রাক্তন কর্তা ট্রুপ সাহেবের মতে মেহগিনি গাছ ভারতের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বেশ ভালভাবেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তবে মাটি খুব আলগা ও নরম হওয়া চাই, জল যেন না দাঁড়ায় এবং চারা অবস্থায় পোকা ও আগাছায় গাছের

যেন ক্ষতি না করে। মেহগিনি গাছ মলিয়েসি গোত্রের অন্তর্গত। খাঁটি স্প্যানিস মেহগিনি ছাড়া আরও কয়েক জাতের মেহগিনি গাছ আছে সোয়েটেনিয়া ম্যাক্রোফাইলো তাদের মধ্যে অন্যতম, ইংরাজীতে এর নাম বাসটার্ড মেহগিনি।

তুনঃ সংস্কৃতে তুন গাছের নাম নন্দী বৃক্ষ, আর এক নাম মহানিম্ব। মেহগিনি গাছের সমগোত্রীয়। মেহগিনির মত গুণে অতুলনীয় না হলেও তুন কাঠ বেশ দামী কাঠ। এই কাঠের বড় সুন্দর রঙ, ইটের মত লাল, এই কাঠ সহজে সিজন্ করা যায়, গরমে ফাটে না বা বাঁকে না, সহজে উইও ধরে না। কাঠের গন্ধও বেশ চমৎকার। আমাদের দেশে কারু-কার্য করা বাক্স, সৌখিন আসবাব, ও সিগারেটের বাক্স তৈরির কাজে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও অস্ট্রেলিয়াতে প্রচুর রপ্তানী হয়। ইংলণ্ডে এই কাঠের নাম মৌলমেন-সিডার।
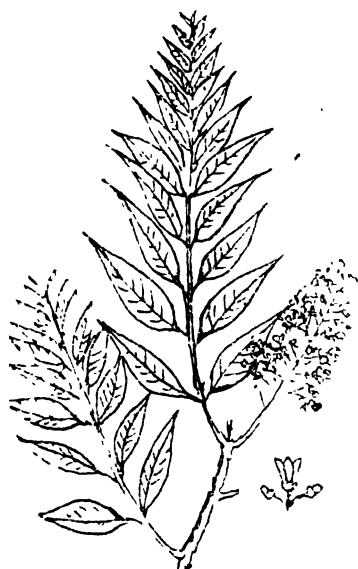
তুন

বৃহদাকার গাছ, চকচকে সবুজ যৌগিক পাতা, বসন্তের প্রথমে ফুল ফোটে, সাদা ছোট ছোট ফুল, গুচ্ছ গুচ্ছ ধরে, মধুর মত মিষ্টি গন্ধ। প্রতিটি ফুলে কমলা রঙের একটি চক্র আছে, তাতে লাগান থাকে পাঁচটি পুংকেশর। ফুল থেকে একরকম বাসন্তী রঙ পাওয়া যায়, বোম্বাইয়ে এই রঙের নাম গুলতুন। এই বাসন্তী রঙটি সাধারণতঃ কাপড় ছোপানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। কলকাতার আশে পাশে কয়েকটি তুন গাছ আছে। আমাশয় রোগে তুনের ছাল কবিরাজগণ

ব্যবহার করে থাকেন। তুনের বৈজ্ঞানিক নাম সেড্রেলা তুনা, এরা মেলিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত।

নিম : কথিত আছে দেবতারা যখন স্বর্গে অমৃত নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার কয়েক ফোঁটা পড়েছিল নিমগাছের ওপর, নিমের তাই অনেক গুণ। নিমের আর এক নাম অমৃত। নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও শিকড় এদের বলে পঞ্চনিম্ব। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে পঞ্চ-নিম্বের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সুশ্রুত সংহিতায়ও নিমের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

চিরসবুজ বিরাট আকারের গাছ, সাধারণতঃ শুষ্ক ও উষ্ণ অঞ্চলে বেশী দেখা যায়। পথের দুপাশে নিমগাছ ছায়া ও সৌন্দর্য দুইই এক সঙ্গে দান করে। নিমের পাতা যৌগিক, কিনারা খাঁজ কাটা। বসন্তে কচিপাতা ধরে, তারপর ছোট ছোট সাদা ফুলের স্তবকে গাছ ভরে ওঠে। মধুর মত মিষ্টি গন্ধ ফুলে। বর্ষার প্রথমে হলুদ রঙের ফল পাকে, পাখীদের তা অতি প্রিয়বস্তু। প্রতিটি ফলে একটি বীজ, কদাচিৎ দুটি বীজ থাকে। নিমের বীজ থেকে বিখ্যাত মূল্যবান মারগোসা তেল তৈরি হয়। ঔষধ হিসাবে নিমতেলের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। নিমের ছাল থেকে একরকম গঁদের মত আঠা পাওয়া যায়। বসন্তকালে সতেজ, ফলন্ত গাছের ছাল চিরে রাখলে সময় সময় খেজুর রসের মত এক রকম রস পাওয়া যায়, তার নাম নিমের তাড়ি। নিমের আঠা ও তাড়ি প্রধানতঃ ঔষধ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। নিমের কাঠ বেশ শক্ত, মধ্যকার অংশ (হার্ট উড্) লাল রঙের, আসবাব পত্র, নৌকা তৈরি ও গরুর গাড়ি তৈরির কাজে লাগে।

নিম

নিমপাতা কৃমিনাশক এবং কীটনাশক। নিমের তেল, নিমপাতা, ছাল ও শিকড়—বাত ও বসন্ত রোগে এমন কি কুষ্ঠ রোগেও কবিরাজগণ ব্যবহার করে থাকেন। নিমগাছের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাজাডিরাকটা ইণ্ডিকা, এরা মেলিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের আর একটি গাছ ঘোড়ানিম বা মহানিম।

পাঁচ

আম: ফলের রাজা আম। ইংলণ্ডের যেমন ওক, ইতালীর অলিভ, আরবের খেজুর, জাপানের চেরী, ভারতবর্ষের তেমনি আম আর অশ্বত্থ। আমাদের দেশের মাটির পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদের নাম। বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রায় চার হাজার বছর ধরে আমের ব্যবহার আমরা করে আসছি। তামিল ভাষায় আমের নাম ম্যাংগা, সম্ভবতঃ ম্যাংগার অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে ম্যাংগোতে। সংস্কৃতে আমের নাম আম্র, চূত, রসাল, সহকার, কল্পবৃক্ষ ইত্যাদি। বেদে আমের উল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে আম্রবনের উল্লেখ আছে বহু স্থানে। আদিকবি বাল্মীকি আম্রফলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সচেতন ছিলেন। প্রেমের দেবতা মন্মথের পঞ্চশরের একটি শর হচ্ছে আম্র-মঞ্জরী। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ সর্গে সেই আম্রমঞ্জরীর উল্লেখ আছে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের একটি পর্বতের নাম ছিল আম্রকূট। বৌদ্ধযুগে আম্র-ফলের যথেষ্ট সমাদর ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১৫০ সনে সাঁচীস্তূপ নির্মিত হয়, তার গায়ে আমগাছ ও আমের বহু অপূর্ব নক্সা আছে আঁকা। পরিব্রাজক ফা-হিয়েন লিখেছেন, ভগবান তথাগতের বিশ্রামের জন্য কোন আম্রদ্বারিক একটি সুবিস্তৃত আম্রকানন উপহার দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ভারতের বিখ্যাত মনীষী শার্ঙ্গধরের এনসাইক্লোপিডিয়াতে আমগাছের রোপণ পদ্ধতি এবং নানা রোগের হাত থেকে এই গাছকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায়

বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তা-ছাড়া চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্ত, মদন পাল প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যদের গ্রন্থে আমগাছের নানারকম ভেষজ গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে।

আকবর বাদশাহ নিজে একজন আম্র-রসিক পুরুষ ছিলেন। তিনি দ্বারভাঙ্গার কাছে এক বিরাট আম্রকানন তৈরি করান। তার নাম দিয়েছিলেন লাখ বাগ। প্রায় এক লক্ষ নানা জাতের আমগাছ নিয়ে এই আম্রকানন গড়ে উঠেছিল। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে আমগাছ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন বাংলা, গুজরাট, খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যে এই

আম

গাছ প্রচুর জন্মায়। মানুষ সমান উঁচু ও অতি সুস্বাদু ফল ধরে এমন এক-জাতের আমগাছ আছে বাংলাদেশে।

আমের প্রতি অনুরাগের এই কাহিনী সর্বকালীন হলেও কয়েক-জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই ফলের ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। শোনা যায় সম্রাট বাবর তাঁদের মধ্যে অন্যতম, সারা হিন্দুস্থানের আমের প্রতি এই অনুরক্তি তাঁর কাছে আতিশয্য বলে মনে হত। অতীতের কয়েকজন ইংরাজশাসক উপেক্ষাভরে এই ফলটির নাম দিয়েছিলেন বাথরুম ফ্রুট। যাই হোক তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

আম সমতলের গাছ। তিন হাজার ফুটের বেশী উঁচু পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই আমগাছ দেখা যায় প্রচুর সংখ্যায়। আমাদের দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ ফলচাষের জমিতেই আমের বাগান আছে। আমাদের দেশের অনুকূল আবহাওয়ায় আমগাছ যে কত বিরাট হতে পারে তার এক বর্ণনা পাওয়া যায় ডক্টর রাণধোয়ার লেখা থেকে ; পাঞ্জাবে চণ্ডীগড়ের কাছে বুরেল গ্রামে এমন একটি আমগাছ আছে, যার কাণ্ডের পরিধি ৩২ ফুট, ডালগুলির পরিধি পাঁচ থেকে বারো ফুট, ডালগুলি ৭০-৮০ ফুট লম্বা এবং প্রায় ২৭০০ বর্গ গজ জায়গা জুড়ে গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। বছরে এই একটি গাছ থেকেই আম হয় প্রায় সাড়ে চারশ মণ। শিবপুরের শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চীপুরমে একামেশ্বরের মন্দিরে একটি আমগাছ আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে বৈদিক আম্রবৃক্ষ। তাদের মতে গাছটির বয়স দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর। গাছটি প্রায় অর্ধশায়িত, বড় বড় খুঁটি লাগিয়ে তাকে খাড়া রাখা হয়েছে। সর্বাঙ্গে বড় বড় আঁশের মত ফাটল। গাছটির চারটি বিভিন্ন শাখায় আমের স্বাদ নাকি চার রকমের, তাইজন্য এর নাম বৈদিক আম্র। ১৯৫৭ সালে বিশেষজ্ঞগণ গাছটির বয়স নির্ধারণের জন্য একটি পরীক্ষা চালান, তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন গাছটির বয়স অন্ততঃপক্ষে ছ' সাত শ বছর।

আমের যে কত রকমের ভ্যারাইটি আছে তার সঠিক হিসাব সংগ্রহ করা কঠিন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে আমের ভ্যারাইটির

সংখ্যা নিশ্চিতরূপে এক হাজারের ওপর, প্রায় বারো থেকে চৌদ্দ শর কাছাকাছি। অনেকেরই মতে এর মধ্যে স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় হল বোম্বায়ের 'আলফনসো' ভ্যারাইটি। এই বিষয়ে ল্যাংড়া ও মালদা আমেরও অবশ্য যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

ল্যাংড়া নামের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি গল্প শোনা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে দৈবাত একটি সাধারণ আম গাছের আঁঠি থেকেই এই অতি উপাদেয় আমটির প্রথম জন্ম হয়েছে। প্রবাদ আছে কাশীর কোন ল্যাংড়া ফকিরের বাড়ির পেছনের উঠানে এই জাতের আম-গাছের প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল, তাই এই আমের নাম হল ল্যাংড়া ফকিরের আম বা ল্যাংড়া আম। কেউ কেউ বলেন কাশীতে একবার প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল, ঝড় থামবার পর দেখা গেল একটি আমগাছ ডালপালা নিয়ে এমনভাবে মাটির ওপর হেলে পড়েছে যেন এক খঞ্জ মানুষ এক-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আশ্চর্যের বিষয়, পরে এই আমগাছ থেকেই অতি সুমিষ্ট আম পাওয়া গেল। তাই এর নাম হল ল্যাংড়া গাছের আম বা ল্যাংড়া আম। অনেকে আবার বলেন কাশীর কাছে ল্যাংড়া গ্রামে এই জাতের আমগাছের প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল, তাই ল্যাংড়া গ্রামের আমকে লোকে পরে বলতে সুরু করল ল্যাংড়া আম। এর মধ্যে কোন গল্পটি সত্যি, তা আজ বলা শক্ত।

আমের নাম থেকে আমের স্বাদ, গন্ধ ও আকারের কিছুটা পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যায়। যেমন গোলাপখাস, সফেদা, হিমসাগর, জাফরান, বেগুনফুলি ইত্যাদি। আমের নামের সঙ্গে কোন অভিজাত ব্যক্তির পছন্দ বা নাম জুড়ে দিয়ে আমের কৌলীন্য বাড়াবার প্রয়াসও অনেক সময় দেখা যায়, যেমন রাণীপসন্দ, ইমাম-পসন্দ, আমিন আবদুল হায়াৎ খান, আমিন মহম্মদ ইনুসখান ইত্যাদি অনেক আমের নামের সঙ্গে আবার নগরের নাম, প্রদেশের নাম, নদীর নামও আছে জড়িয়ে, যেমন মুর্শিদাবাদ, বোম্বাই, বাঙ্গালোরা, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি। তাছাড়া আপাত অর্থহীন কত নামের যে

আম আছে তার ইয়ত্তা নেই। আমের ভ্যারাইটিগুলির প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের দেশে যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদও আছে। উত্তর প্রদেশে যে আমের নাম তোতাপুরী, দক্ষিণ ভারতে সেই একই আমকে বলে বাঙ্গালোরা। আবার কলকাতার বাজারে যে আমের নাম মালদা ভ্যারাইটি, উত্তর প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি ভ্যারাইটির নাম তাই। ভ্যারাইটির সঙ্গে ভ্যারাইটির প্রজনন এবং এবং খুশি মত নূতন নামকরণ অথবা বাজারে প্রচলিত বিখ্যাত আমের নামগুলির অপব্যবহারের ফলেই এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বিগত আন্তর্জাতিক হার্টিকালচারাল কংগ্রেসে এবং গত ১৯৪৭ সালে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হার্টি-কালচারাল ওয়ার্কারস কনফারেন্সে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আমের জন্মভূমি হচ্ছে পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে, আসাম, চট্টগ্রাম ও আরাকানের জঙ্গলে। এই সব অঞ্চলে প্রচুর বুনো আমগাছ দেখা যায়। প্রকৃতির কোলেই তারা লালিত-পালিত হয়। বছরের সব সময়ই আমগাছে কিছু কিছু সবুজ পাতা ধরে, তাই আমগাছ বারোমাসই সবুজ। সৌরভ-ধন্য আম্রমঞ্জরী দেখা দেয় শীত ও বসন্তের সন্ধিক্ষণে। প্রথম ফোঁটা আম্র-মঞ্জরীর গন্ধ অপূর্ব; কিন্তু পরের ফোঁটা ফুলে এই গন্ধ বিলীয়মান। ছোট ছোট ফুল, সবুজ ৩—৫টি বৃত্যংশ, ৪—৫টি পাপড়ি। ফুলগুলি উভয়লিঙ্গ বা একলিঙ্গ (পুরুষ)।

দু-রকম ফুলই একই গাছ থেকে একই শাখায় ফোটে। পুরুষ ফুলের সংখ্যাই বেশী, তাই অজস্র ফুলের তুলনায় ফলের সংখ্যা নগণ্যই। অধিকাংশ আমগাছের ফলনই প্রতি বছর সমান হয় না, কয়েক বছর অন্তর অন্তর একবার আশাতীত বেশী ফল ধরে। আমগাছের জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আমাদের দেশের কয়েকজন গবেষক বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর পবিত্রকুমার সেন, ডক্টর সুনীলকুমার মুখার্জি, ডক্টর

এবং শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মল্লিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমগাছের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাংগিফেরা ইনডিকা। হুকার ও জ্যাকসন সাহেবের মতে ম্যাংগিফেরা জাতির প্রায় ৬৫টি প্রজাতি আছে। এঙ্গালার ও প্র্যাণ্টল সাহেবের মতে এই প্রজাতির সংখ্যা ৩২। ডক্টর সুনীলকুমার মুখার্জি প্রায় ৪১টি প্রজাতির বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষে মাত্র আমের তুইটি প্রজাতি দেখা যায় ম্যাংগিফেরা ইনডিকা ও ম্যাংগিফেরা সিল্ভাটিকা। বাজারে যে অজস্র ভ্যারাইটির আম দেখা যায় তা সবই ম্যাংগিফেরা ইনডিকার বিভিন্ন ভ্যারাইটি। ম্যাংগিফেরা সিলভাটিকা বুনো আম—তা মানুষের অখাদ্য। আসাম ও আরাকানের জঙ্গলে এই আম ফলে। আম আনাকারডিয়াসী গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের অন্যান্য গাছের মধ্যে জিওল ও আমড়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

জিওল ঃ সংস্কৃতে জিওলের নাম জিঙ্গিনী বা তাজশৃঙ্গী। জিওল আমগাছেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু উচ্চকুলে জন্ম নিলেও জিওলের ফল আমের মত সুস্বাদু নয়, জিওলের কাঠও বিশেষ ভাল নয়। একই গোত্রের অন্তর্গত তুটি প্রজাতির গুণ যে কত তফাত হতে পারে জিওল ও আম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জিওল-গাছ হিমালয়ের পাদদেশে, আসাম ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর জন্মায়। জিওল জংলী-গাছ, জঙ্গলের মধ্যে অথবা বাংলা দেশের গ্রাম-প্রান্তরে অবহেলার মধ্যেই জিওল বড় হয়ে ওঠে। বাংলা দেশে জিওল-গাছ আকারে খুব বড় হয় না। আমের মত জিওল চিরহরিৎ গাছ নয়। শীতের প্রথমে জিওলের
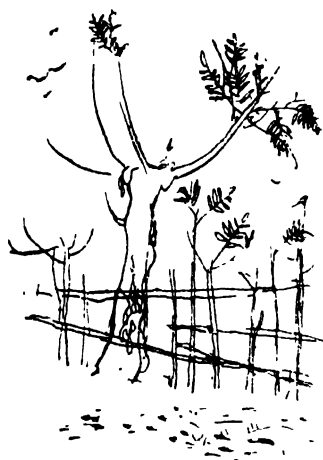
জিওল

পাতা পড়তে শুরু হয়, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পত্রহীন রিক্তশাখায় ফিকে সবুজ ছোট ছোট ফুলের স্তবক ধরে। ফুলগুলি একলিঙ্গ। সাধারণতঃ দুটি স্বতন্ত্র গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটে, তবে একই গাছের দুটি পৃথক শাখায় স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের অস্তিত্ব একেবারে বিরল নয়। ফলগুলি নিমফলের মত ছোট ছোট, ভিতরে একটি করে থাকে শক্ত বীজ। পাখীরা ফল খায়, তারাই বীজের বিস্তার করে। পল্লীগ্রামে জিওলের গাছ জমির নিশানা ও বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

জিওলগাছ থেকে একরকম আঠা পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত তৈরির সময় সেই আঠা মাখান হয় তাকে শক্ত করার জন্য। প্রিণ্টিং ও কাগজ শিল্পে এই আঠা কাজে লাগে। জিওলের ছাল থেকে একরকম রং পাওয়া যায়, সিল্ক ছোবানোর কাজে ও চর্মশিল্পে এর ব্যবহার আছে। জিওলের ছাল আঠা পাতা থেকে নানা-রকম কবিরাজী ঔষধ তৈরি হয়। চর্মরোগ, আমাশয়, আলসার, দাঁতের অসুখ ও দৈহিক স্ফীতিতে এই সব ঔষধের ব্যবহার আছে।

সজিনা ঃ সংস্কৃতে সজিনার নাম শিগ্রু বা শোভাঞ্জন। বড় চমৎকার নাম। সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে সজিনার উল্লেখ আছে বহু স্থানে। বাংলা দেশে সজিনা গাছ অতি পরিচিত গাছ। খুব সহজেই, প্রায় বিনা তদারকেই সজিনা গাছ বড় হয়ে ওঠে। কলকাতার আশে পাশে, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা-জেলায় প্রচুর সজিনা গাছ দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলে সজিনার স্বাভাবিক বাসভূমি। সজিনার কাণ্ড নরম, ছালের রং ধূসর, অতি নরম ডালপালা, সুন্দর কাটা কাটা যৌগিক পাতা। শীতের মাঝামাঝি কচিপাতার সঙ্গে অজস্র ছোট ছোট সাদা ফুলের স্তবক বেণীর আকারে দুলতে থাকে। সজিনার ফল অর্থাৎ সজিনার ডাঁটা পাকে শেষ বসন্তে। সজিনা-ফুলের পাঁচটি পাপড়ি, ১০।১২টি পুং কেশর, তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি

কেশর, পরাগ রেণু বহন করে। সজিনাফুল ভাজা ও ডাঁটার চচ্চড়ি ছাড়া, সজিনা ডাঁটার আচারও খুব সুস্বাদু। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে প্রায় তিনশ রকমের আচারের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সজিনা ডাঁটার আচারের প্রশংসাও তিনি করেছেন। আগেকার আমলের সাহেবদের সজিনার শিকড়ের স্যালাড অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল। তারা গাজরের মত সজিনার শিকড় রান্না করেও খেত।

আফ্রিকাতে সজিনা গাছ স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মায়। আফ্রিকার সজিনার (মরিঙ্গা আপটেরা) বীজ থেকে একরকম বর্ণহীন দামী এবং অতি প্রয়োজনীয় তেল পাওয়া যায়, যার নাম 'বেন অয়েল।' ঘড়ির সূক্ষ্ম কল-কব্জায় ব্যবহারের জন্য এর চাহিদা পৃথিবী-ব্যাপী। সুগন্ধ ধরে রাখবার ক্ষমতাও এ তেলটির অদ্বিতীয়। নানা রকম নির্যাসের দ্রাবক হিসাবে এই তেলটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

সজিনা

বাংলা দেশের সজিনার বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তা কোন অংশেই আফ্রিকার সজিনার তেল থেকে খারাপ নয়। গত শতাব্দীতেই ওয়াট সাহেব মন্তব্য করেছিলেন ঃ

Ben oil is one of the best lubricants for fine machinery ; India might easily, and apparently profitably, supply the whole world with Ben or Moringa oil, and it is to be hoped that attention may be directed to the subject.

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সজিনার ছাল ও শিকড় থেকে নানা-রকম ঔষধ তৈরির বিবরণ পাওয়া যায়।

ছয়

এ কথা প্রায় সকলেই জানেন গাছ মাটি থেকে পুষ্টির জন্য কয়েকটি মৌলিক পদার্থের লবণ গ্রহণ করে, নাইট্রজেন-ঘটিত সার তার মধ্যে অন্যতম। গাছের জীবনে নাইট্রজেনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাতাসে যথেষ্ট নাইট্রজেন থাকলেও তা সাধারণ গাছের কোনই কাজে লাগে না, যতক্ষণ না আকাশের বিদ্যুতের সহায়তায় অথবা কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় বাষ্পীয় নাইট্রজেন মাটির সঙ্গে মিশে পরিণত হয় নাইট্রজেন-ঘটিত কয়েকটি সারে।

ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে; শিম, মটর প্রভৃতি শুটি জাতীয় লিগু-মিনাস গাছেরা মাটির নাইট্রজেন সারের ওপর খুব বেশী নির্ভরশীল নয়, পরোক্ষভাবে তারা বাতাসের নাইট্রজেনই গ্রহণ করে। স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা সহ-অবস্থান মেনে নিয়েছে এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে, সমষ্টিগতভাবে যাদের নাম হল রাইজো-বিয়াম। এই জীবাণুগুলি শুঁটী জাতীয় গাছের শিকড়ে একরকম গুটি (নোডিউল) তৈরি করে বসবাস করে। এরা বাতাস থেকে নাই-ট্রজেন বাষ্প সরাসরি নিয়ে নাইট্রজেন-ঘটিত খাদ্য তৈরি করে এবং বিশ্বস্তভাবে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে যোগান দিয়ে যায়, পরিবর্তে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কাছ থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। তাই শিম, মটর, মুগ, কলাই প্রভৃতি ডালে প্রোটিনের পরিমাণ একটু বেশীই। এই শুঁটী জাতীয় গাছ সবুজসার হিসাবেও ব্যবহার করা হয় জমিতে। অবশ্য শুঁটী জাতীয় সকল উদ্ভিদের শিকড়েই যে এই ধরনের গুটি দেখতে পাওয়া যায় তা নয়, কাসিয়া, সেরসিস প্রভৃতি গাছের শিকড়ে কোন গুটি নেই। তাছাড়া জীবাণুর সঙ্গে এই সহ-অবস্থানের বিষয়টি শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদের একেবারে

একচেটিয়া বৈশিষ্ট্যও নয়। আলনাস, ক্যাস্থুরিনা, মাইরিকা প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর উদ্ভিদের শিকড়েও এই জাতীয় গুটি আছে তবে প্রকৃতিতে তাদের সংখ্যা খুবই বিরল।

সকল জীবনের সুহৃদ এই শুঁটী জাতীয় গাছের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব অল্প নয়। প্রকৃতপক্ষে সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরাই দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী। শস্য হিসাবে, নানা রকম ফুল-ফল হিসাবে, প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সম্পদ হিসাবে আমরা প্রায় সভ্যতার সূচনা থেকেই এদের ব্যবহার করে আসছি। তিনটি সহ-গোত্রে (sub-family) এরা বিভক্ত, যথা পাপিলিওনেসী, সিসালপিনি, এবং মাইমোসী।

পলাশ: শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এরা পাপিলিওনেসী সহ-গোত্রের অন্তর্গত। পলাশের আর একটি সংস্কৃত নাম কিংশুক, হিন্দী নাম ঢাক বা চালচা, উর্দুতে বলে, পলাশপাপরা।

শীতের প্রথম থেকেই পলাশের পাতা ঝরতে সুরু হয় একটি দুটি করে। শীতের মধ্যভাগে শুকনো ঝরাপাতায় পলাশের বন ওঠে ভরে, গভীর ধূসর রঙের আঁকা-বাঁকা বিশুষ্ক ডালপালা কিসের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে কিছু কাল,—তারপর বসন্তের প্রথমদিন-গুলিতে অতুলনীয় সৃজনীশক্তির পরশে সমস্ত গাছ ভরে ওঠে ফুলের থোকায়। সমস্ত বন জুড়ে পলাশের রঙ ছড়িয়ে পড়ে, লাল ও কমলা রঙের মিশ্রণে অগ্নিশিখার মত যার রূপ,—পলাশের আর একটি তাই সার্থক নাম 'ফ্লেম অব দি ফরেষ্ট'। বাংলা ও বিহারের শুকনো কয়লার খনি অঞ্চলে এবং পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচুর পলাশগাছ আছে। প্রকৃতির কোলে সেখানে তারা আপনা আপনি লালিত পালিত হয়। মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট পলাশ গাছ আছে। পলাশ ভারতের নিজস্ব গাছ। যে পলাশীর যুদ্ধে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল কথিত আছে সেই পলাশীর মাঠ এবং পলাশী গ্রামের নাম হয়েছে কাছের পলাশ বনের নাম থেকেই।

মাঝারি আকারের গাছ। তিনটি ফলকবিশিষ্ট গভীর সবুজ রঙের বড় বড় পাতা। শালপাতার মত ঠোঙ্গা তৈরির কাজেও পলাশপাতা ব্যবহৃত হয়। পলাশের ফুলগুলি আকৃতিতে মটরফুল বা ছোট ছোট বকফুলের মত দেখতে। এই সহ-গোত্রের সকল ফুলের আকৃতিই একরকম, শুধু সাইজ ও রঙের যা পার্থক্য। ফুলে সুগন্ধ নেই কিন্তু সুমিষ্ট মধু আছে,—যার লোভে নানান জাতের পোকা মাকড় এসে ভিড় করে ফুল ফোটার সময়। সেই সঙ্গে নানান জাতের পাখী—টুনটুনি, ময়না, টিয়া ও কাকেরাও আসে, ফুলগুলিকে তারা ঠুকরে ঠুকরে ছড়িয়ে ফেলে চারিদিকে। বনের সবুজ ঘাস ঢাকা পড়ে কোমল পাপড়ির বর্ণোজ্জ্বল আভরণে। গ্রীষ্মের প্রথমেই নূতন পাতার সঙ্গে পলাশের ফল বা শুঁটী ধরে গাছে, প্রতি ফলে একটি মাত্র বীজ। পরিপক্ক ফল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

পলাশ আমাদের একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ। আমাদের দেশের গালা বা লাক্ষা শিল্প গড়ে উঠেছে এই গাছেরই ওপর নির্ভর করে। রেশম কীটের মত গালা বা লাক্ষা কীট যে কোন গাছের ওপর বসবাস করা পছন্দ করে না; পলাশ, কুসুম, কুল প্রভৃতি কয়েকটি গাছের ওপরই এরা গালা উৎপন্ন করে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। কুসুম গাছে এরা যে গালা উৎপন্ন করে তা গুণে সর্বোৎকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে পলাশগাছের গালাই সর্বশ্রেষ্ঠ। লাক্ষা-কীটের চাষ ছোট ছোট কুটীরশিল্পের আকারে এবং ব্যাপকভাবে পুরুলিয়া অঞ্চলে এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে পলাশ এবং কুসুম গাছ জন্মায় সেখানে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাগার কর্তৃক প্রচারিত একটি তথ্য থেকে জানা যায় বর্তমানে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় তিন-চতুর্থাংশ গালা উৎপন্ন হয় আমাদের দেশেই এবং এর সাহায্যে প্রতি বছর প্রায় আট কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা আসে আমাদের দেশে। পলাশের গুঁড়ি থেকে একরকম আঠা পাওয়া যায় তার নাম কিনো আঠা। এই আঠাটি চর্মশিল্পে ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পলাশের বীজ

এবং ছাল থেকেও নানা রকম ঔষধ তৈরি হয়। বিশেষতঃ নানা রকম স্ত্রী রোগে এই সব ঔষধের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।

হিন্দুশাস্ত্রে পলাশের স্থান বেশ উঁচুতে নির্দেশ করা হয়েছে। যজ্ঞ ও হোমে পলাশকাঠ এবং উপনয়ন ও ছাত্রের দীক্ষার সময় পলাশপাতার ব্যবহার প্রচলিত। পলাশের তিনটি পত্রফলককে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের রূপক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে শাস্ত্রে।

পলাশের বৈজ্ঞানিক নাম বুটিয়া মনোসপারমা। অষ্টাদশ শতকের উদ্ভিদ-রসিক আর্ল অব বুটির নাম অনুসারে এই নাম দেওয়া হয়েছে। মনোসপারমা অর্থ একটি মাত্র বীজ যার, পলাশ ফলের একটি

পলাশ

মাত্র বীজ, তাই এই নাম। বিরাট আকারের লতানে পলাশও (বুটিয়া-সুপারবা) আমাদের দেশের জঙ্গলে পাওয়া যায়, অন্যান্য

গাছের ওপর এই লতানে পলাশ লতিয়ে লতিয়ে ওঠে, এর ফুলগুলি আরো বড় এবং আরো সুন্দর। পলাশের সহ-গোত্রের বহু তরুলতা আমরা চারদিকে দেখতে পাই, তার মধ্যে শিশু গাছ, পলতে মাদার, করঞ্জা, সিত-শাল, পীতশাল, জ্যামাইকা এবনি, জ্যামাইকা ডগ-উড, বারমিজ রোজ-উড প্রভৃতি গাছ থেকে নানা শ্রেণীর কাঠ পাওয়া যায়। ফুলের গাছ অতসী, জয়ন্তী, অপরাজিতা, বকফুল আমাদের খুবই পরিচিত। ফল ও শস্য হিসাবে শিম, মাখম শিম, বরবটি, ছোলা, মটর কলাই, অড়হর, মসুরি, মুগ, চিনাবাদাম এরা তো আছেই। আমাদের দেশে এক সময়ে নীলের চাষের খুব প্রচলন ছিল, সেই নীল গাছ (ইণ্ডিগোফেরা সুমালিয়ানা) এই সহ-গোত্রের অন্তর্গত। এ ছাড়া শোণ, শোলা, কুঁচ, বনমেতী, ধঞ্চে, গোরক্ষ-চাকুলিয়া, আলকুশী প্রভৃতি গাছ নানা শিল্পে ও ঔষধ প্রস্তুতে কাজে লাগে।

অশোকঃ শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এরা সিসালপিনি সহ-গোত্রের অন্তর্গত। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অশোকতরুর নাম জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্য ভাবে। আমাদের দেশের রূপে ও সৌরভে অতুলনীয় পাঁচটি ফুলকে গণ্য করা হয় প্রেমের দেবতা মন্মথের পাঁচটি শর হিসাবে,—অশোক তার মধ্যে একটি, অন্য চারিটি শর হল অরবিন্দ, আম্র, নবমল্লিকা বা শিরীষ এবং নীলোৎপল। কথিত আছে মদনদেব যখন অশোক গাছে লুকিয়ে ছিলেন মহাদেব তখন তাঁকে ভস্ম করেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের সুন্দরীদের প্রশ্রয়ধন্য সমাদর লাভ করে এসেছে এই ফুলটি। ভাব-মিশ্রের ভাব প্রকাশে অশোকের আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে তাই অঙ্গনা-প্রিয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রকাররা লিখেছিলেন অশোকের দেহে পুষ্পিত যৌবন আনবার জন্য সৌষ্টবশালিনী যুবতীর পদস্পর্শের প্রয়োজন। এই প্রথা অতি প্রাচীন কাল থেকেই আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের দেশের সর্বত্র পালিতও হয়ে এসেছে। অশোক শোক

নিবারণ করে এই সংস্কার আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে আজও আছে। বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেও অশোকের পবিত্রতা অধিক। কথিত আছে গৌতম বুদ্ধ অশোক তরুর ছায়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মন্দিরের উদ্যান রচনায় অশোকতরুর ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।

অশোক

ছোট আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ। শীর্ষ পত্রভারে অবনত। পত্র-যৌগিক, বহু ফলকবিশিষ্ট। কিশলয়ের রঙ প্রথমে থাকে অতি হাল্কা সবুজ, তারপর ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে ওঠে, রক্তিম কিশলয়-গুলি ফুলের থোকার মত নীচের দিকে ঝুলতে থাকে, ফুল না থাকলেও অশোকের সৌন্দর্য তাই ম্লান হয় না। রক্তিম কিশলয়ে পরে সবুজ রঙ ধরে, তখন অন্যান্য পাতার মত এদের গতি হয় ঊর্ধ্ব-মুখী। সারা বসন্তে ও গ্রীষ্মে অশোকের ফুল ফোটে। অশোক ফুলের কোন পাপড়ি নেই, ফুলের সৌন্দর্য প্রধানতঃ নির্ভর করে

রঙীন মঞ্জরীপত্র, বৃতি ও দীর্ঘ পুং কেশর গুচ্ছের ওপর। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের রঙ প্রথমে থাকে কমলা, পরে পরিবর্তিত হয়ে যায় সিঁদুর রঙে।

ভারতবর্ষ ও মালয় দেশে অশোকের স্বাভাবিক বাসভূমি। অশোকের ফুল ও গুঁড়ির ছাল নানা রকম জটিল স্ত্রীরোগে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নারীর গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্যও অশোকের ছালের ব্যবহার পূর্বে প্রচলিত ছিল।

অশোকের বৈজ্ঞানিক নাম সারাকা ইণ্ডিকা। ইতালীর বিখ্যাত চিকিৎসক ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ সিসালপিনি (১৫১৯-১৬০৩) নাম অনুসারে অশোকের সহগোত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল সিসালপিনি। এই সহগোত্রের অনেক গাছেরই সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ, গুল-মোউর বা গোল্ড মোহরের ফুলের বাহারে শেষ বসন্তের দিনগুলি অপূর্ব কমনীয়তা লাভ করে। এদের প্রায় একই সঙ্গে ফোটে কৃষ্ণচূড়া সোঁদাল, শ্বেত ও রক্ত কাঞ্চনের ফুল। এ ছাড়া তেঁতুল, নাটা, অঞ্জন, দাদমর্দন, কালকাসুন্দা, চেহুর, বনবাজ এরা সব একই সহগোত্রের অন্তর্গত।

শিরীষ—শুঁটী জাতীয় বৃক্ষ, মাইমোসী সহগোত্রের অন্তর্গত। শিরীষের আর একটি সংস্কৃত নাম শুকপ্রিয় বা কপিতন, হিন্দী নাম তান্তিয়া বা শিরীণ, তামিল ভাষায় বলে দিরাসন। আমাদের দেশের অতি পুরাতন এবং অত্যন্ত পরিচিত গাছ। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের জঙ্গলেই শিরীষ গাছ জন্মায়। শহরের রাস্তার দুপাশেও রোপণ করা হয়। সুউচ্চ বৃক্ষ, শীর্ষ ছাতার মত, তামাটে ধূসর রঙের ছাল, পত্র-যৌগিক, ৪-৮ ফলক বিশিষ্ট, রং ফিকে সবুজ। শাখার প্রান্তে গুচ্ছ গুচ্ছ শিরীষ ফুল ফোটে গ্রীষ্ম অথবা বর্ষার প্রারম্ভে। ফুলের রঙ ফিকে সবুজ, অশোকের মত রাত্রিবেলায়ই শিরীষ ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে,—অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায় সেই সুগন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায়। ফুলের পুং কেশরের সংখ্যা অসংখ্য। দূর

থেকে এইগুলিই চোখে পড়ে, এই সহ-গোত্রের ফুলের বৈশিষ্ট্যই এই। শীতের সময় শিরীষের যখন শুঁটী পাকে তখন গাছে একটিও পাতা থাকে না, বাদামী রঙের লম্বা লম্বা শুঁটিগুলি বহুদূর থেকেই চেনা যায়। শিরীষের শিকড় সাধারণতঃ মাটির মধ্যে খুব বেশী দূর যায় না, ঝড়ে শিরীষ গাছ পড়ে যাবার সম্ভাবনা তাই বেশী এবং পড়বার সময় অন্য গাছেরও ক্ষতি করে যথেষ্ট।

শিরীষের রূপের যেমন খ্যাতি আছে গুণেরও তেমনি যথেষ্ট কদর। শিরীষ কাঠ বেশ টেঁকসই, ভারতীয় ওয়াল-নাট এই নামে শিরীষ কাঠ বিদেশে রপ্তানী হয়। শিরীষ কাঠে আসবাবপত্র, গাড়ীর
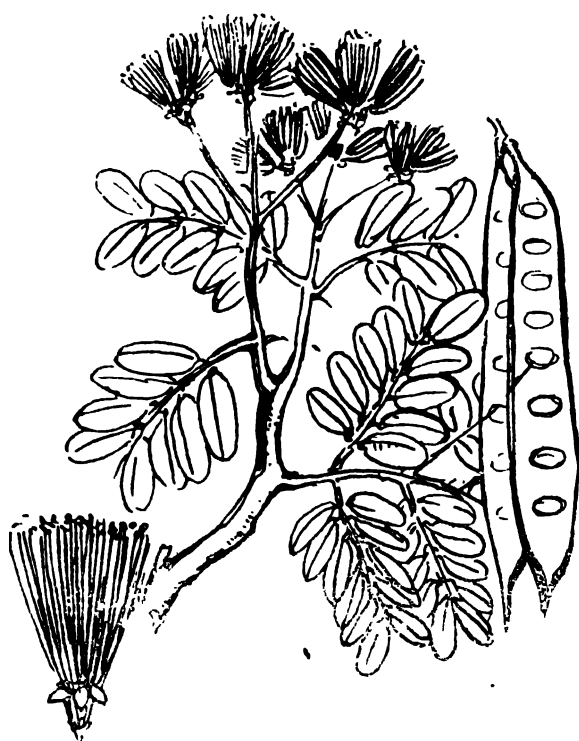
শিরীষ

চাকা, ছবির ফ্রেম ও নানা সামগ্রী তৈরি হয়। শিরীষ গাছের আঠা একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। শিরীষের আঠা বহু কাজে ব্যবহৃত

হয়। শিরীষের শিকড় ও ছাল থেকে বহু রকম কবিরাজী ঔষধও তৈরি হয়।

শিরীষের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যালবিজিয়া লেবেক। অষ্টাদশ শতকের উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ডেল অ্যালবিজির নাম অনুসারে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই সহগোত্রের অন্যান্য নামকরা গাছ বিভিন্ন প্রজাতির অ্যাকসিয়া বা বাবলা। বাবলার আঠা থেকে গঁদ তৈরি হয়। খয়ের গাছ এই বাবলা শ্রেণীরই একটি গাছ। গুঁড়ির আঠা থেকে খয়ের তৈরি হয়; খয়ের গাছের শাখা-প্রশাখা টুকরো টুকরো করে জলে সিদ্ধ করলেও খয়ের পাওয়া যায়, তা অবশ্য গুণে নিকৃষ্ট। এ ছাড়া রঞ্জন, গিলা, লজ্জাবতী, সাঁইকাঁটা প্রভৃতি গাছও এই সহগোত্রের অন্তর্গত।

সেগুন: সেগুনের বৈজ্ঞানিক নাম টেক্‌টোনা গ্র্যাণ্ডিস্, টেকটোন্ একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল ছুতার। সর্বদেশের, সর্বকালের সূত্রধরদের অতি আদরের এই গাছটি, তাই এই নাম। সেগুনের আদি বাসভূমি বাংলাদেশে নয়, প্রায় দেড়'শ বছর আগে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে রক্সবারো সাহেবের আমলে সেগুন গাছের প্রথম আবাদ করবার চেষ্টা করা হয়। এখন যেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটি দাঁড়িয়ে আছে সেইখানেই এই সেগুনের আবাদ ছিল। এর আগেও বাংলাদেশে কিছু কিছু সেগুন গাছ ছিল। দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সেগুন গাছের আবাদ সাফল্যের সঙ্গে পরে করা হয়েছে। কলকাতার পথেঘাটে ও বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে এই গাছটি এখন যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বিরাট আকারের অতি সুন্দর গাছ। রং ফিকে সবুজ, কাণ্ড দীর্ঘ ও সরল, ডালপালার বোঝা তার মাথায় থাকে। দীর্ঘ ঋজু কাণ্ডটি দেখলেই প্রথমে কাঠ হিসাবে ব্যবহার করবার কথাই মনে আসে। পাতাগুলি বিরাট, এক থেকে দু ফুট লম্বা, খসখসে ত্বক, ফিকে সবুজ রং, শীতকালে পাতাগুলি ঝরে যায়। সেগুন গাছের আদি বাসভূমি

ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ভারতের ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার ও মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে। ভারতের বন-বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী আর. এস. ট্রুপ লিখেছেন, গত শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে ৭ ফুট ব্যাসের ৭০ ফুট লম্বা একটি সেগুন গাছ কাটা হয়েছিল যা থেকে প্রায় ৯০০ কিউবিক ফুট কাঠ পাওয়া যায়। এই একটি গাছের এখনকার বাজার দর হল প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। ১৯১৩ সালে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার পত্রিকায় বেঙ্কটরমণ আয়ার মালাবারের ১৯২ ফুট উঁচু এক বিরাট সেগুন গাছের বিবরণ দিয়েছেন, এই গাছটির উচ্চতার গৌরব আজও ম্লান হয়নি। বর্মার কাঠই গুণে সর্বোৎকৃষ্ট। বর্মার জঙ্গলে ১৬-২০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট ১০০-১৫০ ফুট উঁচু সেগুন গাছ অতীতে বহু কাটা হয়েছে। বর্তমান বাজার দর হিসাবে এই এক একটি গাছের বিনিময়ে এক একটি সম্পত্তি কেনা যায়। গত শতাব্দীতে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকরা বনকে বন উজাড় করে সেগুন গাছ কেটে নিয়ে গেছে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ থেকে। তাদের নৌ-শিল্প, যান-বাহন, যুদ্ধাস্ত্র, আসবাবপত্র প্রায় সবই তৈরি হয়েছে এই কাঠ থেকে; এই কাঠ সহজে বাঁকে না, ফাটে না, উই ধরে না, আঁশগুলি সুবিন্যস্ত, চমৎকার পালিশ ধরে, বহুদিন স্থায়ী হয়, সুন্দর মৃদু গন্ধও একটি আছে। অনেকের মতে এটি সেগুন তেলের গন্ধ, এই তেলই কাঠকে স্বাভাবিক ভাবে সীজন করে রাখে দীর্ঘকাল ধরে।
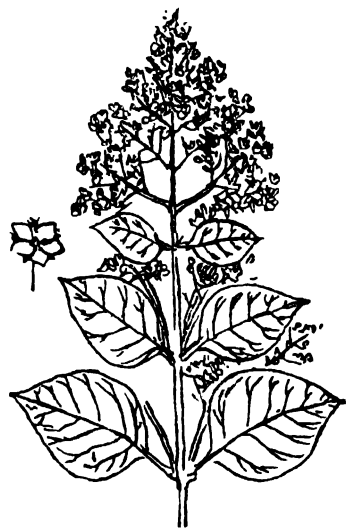
সেগুন

গ্রীষ্মে ও বর্ষায় সেগুনের ফুল ফোটে। সেগুন শাখার প্রান্ত জুড়ে সেগুন ফুলের অতি বিরাট স্তবক ধরে। এক একটি স্তবকের

দৈর্ঘ্য প্রায় ২-৩ ফুট, ফুলগুলি ছোট ছোট, শ্বেতবর্ণের। সেগুনের ফল পাকে শীতকালে। জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় বীজের সাহায্যেই সেগুনের বংশ বিস্তার ঘটে। ট্রুপ সাহবের মতে বুনো হাতি এবং ইঁদুর হল সেগুনের সব থেকে বড় শত্রু। ইঁদুর ধ্বংস করে মাটির তলার অংশ, বুনো হাতি করে ওপরের অংশ। আগুন সেগুনের খুব বড় একটা মারাত্মক শত্রু নয়, সেগুনের কাণ্ড আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেলেও তার পরের বছর দেখা যায় কাণ্ডের তলা থেকে (Root Stalk) চমৎকার বলিষ্ঠ কতকগুলি চারা বেরিয়েছে। অধিক তাপমাত্রায় সেগুন বীজের অঙ্কুরোদ্গমও ভাল হয়। সেগুন গাছের এই তাপ সহিষ্ণুতা আমাদের দেশের উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। সেগুন গাছের জীবনের কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হল নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সমস্যাই। শীতকালে সেগুনের পাতা ঝরে গেলেও ঝরাপাতার বনের অন্যান্য গাছপালার সঙ্গে সেগুনের জীবনের কোন মিল নেই। হিমের স্পর্শ, ঠাণ্ডার প্রকোপ সেগুন একটুও সহ্য করতে পারে না। এদের তাই দেখা যায় গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলের বনভূমিতে—অথচ এই সব অঞ্চলে রবার, বট, পাকুড় প্রভৃতি বিরাট বিরাট চিরহরিৎ গাছ আধিপত্য বিস্তার করে আছে, এদের গভীর ছায়াও সেগুন আদৌ সহ্য করতে পারে না। সেগুনকে তাই সাধারণতঃ দেখা যায় উন্মুক্ত বিরল অরণ্যে—বাঁশ, হরীতকী, বয়ড়া, অর্জুনের মাঝে ছাড়া ভাবে বসবাস করতে। সূর্যালোক সেগুনের খুবই প্রিয়।

সেগুন সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য আছে ওয়াট সাহেবের বইতে। ফারসী ভাষায় সেগুনের নাম হল 'শাল', আরবী ভাষায় সেগুনকে বলে 'সাজ'। তিনি লিখেছেন, অনেকেই মনে করে ভারতীয়রা সম্পূর্ণ ভুল করে অন্য একটি গাছকে শাল গাছ বলে, আসলে সেগুন গাছই হচ্ছে শাল গাছ।

তিনি যাই লিখুন আমাদের দেশে সেগুন সেগুনই, শাল শালই, সেগুন শাল নয়। সেগুন গাছ ভারবেনেসী গোত্রের অন্তর্গত।

হরীতকী, বয়ড়া, অর্জুন : পুরাণে আছে ইন্দ্র যখন স্বর্গে অমৃত পান করছিলেন তখন তার এক ফোঁটা পড়ে পৃথিবীতে তাই থেকে সৃষ্টি হয়েছে হরীতকী গাছ। হরীতকী অতি পবিত্র ফল, মানুষের বহু উপকারে লাগে এই ফলটি। সংস্কৃতে হরীতকীর আর এক নাম অভয়া, বয়ড়ার নাম বিভিতক, অর্জুনের নাম ককুভ। এই তিনটি গাছ একই গোত্রের অন্তর্গত। ভারতের সর্বত্রই প্রায় এরা জন্মায়। তিনটি গাছই আকারে খুব বৃহৎ। শীতকালে এদের পাতা ঝরে যায়। বসন্তের মাঝামাঝি হরীতকীর পত্রহীন শাখায় প্রথম কিশলয় দেখা দেয়, সেই সঙ্গে ফিকে হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল শাখার প্রান্তে স্তবকে স্তবকে ফোটে। ফুলের গন্ধ মনোরম নয়। হরীতকীর ফল পাকে শীতকালে, অজস্র ফল পাখীরা চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে। প্রতিটি ফলে একটি বীজ থাকে। হরীতকী ভারতের আজ একটি প্রধান সম্পদ। অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'ট্যানিন' পাওয়া যায় এই ফলটি থেকে, যা বিভিন্ন কারিগরী শিল্পে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে এই ফলটি বিদেশেও চালান যায়। বয়ড়ার ফল থেকেও ট্যানিন পাওয়া যায় কিন্তু উৎকর্ষতায় হরীতকীর সমকক্ষ নয়।
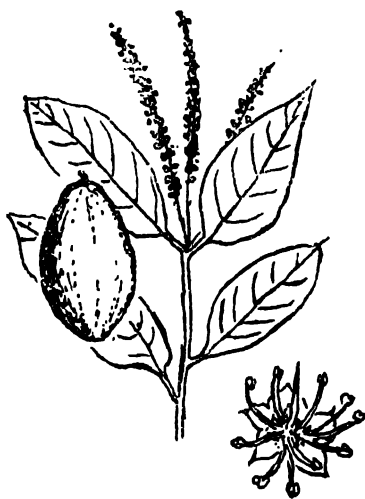
হরিতকী

অর্জুন ও বয়ড়ার ফুল হরীতকীর মতই ছোট ছোট, বসন্তকালে নূতন পাতার সঙ্গে ফোটে। সংস্কৃত কাব্যে অর্জুনের রূপের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু এর গন্ধ আদৌ প্রশংসার যোগ্য নয়। এই তিনটি গাছের ফল ও ছালের কতকগুলি রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। অর্জুন গাছের ছালের রস হৃদরোগের পক্ষে

খুবই উপকারী। হরীতকীর ল্যাটিন নাম টারমিনালিয়া চেবুলা, বয়ড়ার নাম টা-বেলেরিকা, অর্জুনের নাম টা-অর্জুনা। এরা কমব্রেটাসী গোত্রের অন্তর্গত।

জারুল : জারুলের ইংরাজী নাম কুইন অব ফ্লাওয়ার, এর অপর একটি নাম প্রাইড্ অব ইণ্ডিয়া। এর লাইলাক রংয়ের ফুলের ঝাড়, কুঞ্চিত ফুলের পাপড়ি, যার রং ফোটবার পর প্রতিদিনই ফিকে হতে থাকে—এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দিয়েছিল বিদেশীর চোখে।

গত দেড়'শ বছরের মধ্যে বাহারি ফুলের গাছ হিসাবে এর উন্নতিও হয়েছে যথেষ্ট। জারুল গাছ ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং কলকাতার বাগানে ও পথের দুপাশে আজকাল প্রচুর দেখা যায়। প্রধানতঃ ফুলের জন্য জারুলের যে ভ্যারাইটিগুলি ব্যবহৃত হয় তাদের উচ্চতা বিশ ফুটের বেশী হয় না, কিন্তু নদীর তীরে, স্বাভাবিক অরণ্যের মধ্যে জারুলের উচ্চতা ৫০-৬০ ফুটের কম নয়। আসল জারুল কাঠ এই সব গাছ থেকেই পাওয়া যায়।

জারুল

বসন্তের শেষ থেকে বর্ষার শেষ অবধি জারুলের ফুল ফোটে। শীতকালে ফল পাকে যা পরবর্তী বসন্ত অবধি গাছেই থাকে। তাই ফুল ও ফলের বিরল সমাবেশ একই গাছে দেখা যায়। জারুল কাঠের রং ফিকে লাল, মাঝামাঝি চলনসই কাঠ। বাজারে যত কাঠ জারুল কাঠ নামে বিক্রি হয় তাদের অধিকাংশই প্রকৃত জারুল কাঠ নয়। অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠ জারুল কাঠ হিসাবে বিক্রি হয়। ফুলের আকার ও রং হিসাবে জারুলের অনেকগুলি ভ্যারাইটি আছে। বাগান ও পথের শোভার জন্য জারুল গাছের ব্যবহার ক্রমশঃই

আমাদের দেশে বাড়ছে। জারুলের ল্যাটিন নাম ল্যাজেরস্ট্রোমিয়া স্পেসিওসা এরা লিথ্রেসী গোত্রের অন্তর্গত।

সাত

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক ধরনের উদ্ভিদ বাস করে সাধারণ উদ্ভিদের মতই তাদের বাহিরের চেহারাটা বেশ নিরীহ। তারা সর্পিল ডাল-পালা মেলে ওৎ পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়, হঠাৎ ভুল করে কোন জীব-জন্তু বা মানুষ তাদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সরু লিকলিকে ডালগুলি প্রসারিত করে অক্টোপাসের মত আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফেলে, তারপর বিষাক্ত কাঁটার ঘায়ে শিকারকে আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে তার রক্ত মাংস হজম করতে থাকে। কয়েকদিন পরে তাদের বাহুপাশ শিথিল হলে দেখা যায় শিকারের হাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঘোড়াসুদ্ধ একটি ঘোড়-সওয়ারকেও তারা এইভাবে হজম করে ফেলবার ক্ষমতা রাখে। উদ্ভিদ সম্পর্কে এ গল্প খুবই রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নাই, তবে এর সঙ্গে বাস্তবের খুব অল্পই সম্পর্ক আছে। এই গল্পগুলি একান্তভাবে মানুষেরই চিন্তাশক্তি বা দুশ্চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ বলা যেতে পারে।

পৃথিবীতে উদ্ভিদরাই মনে হয় যেন আদর্শ অহিংস জীবন যাপন করে থাকে। তাদের আক্রমণ করলে কোন প্রতি-আক্রমণ করে না, তাদের ঝাড়েবংশে নিধন করবার সংকল্প করলেও তারা কোন প্রতিবাদ জানায় না। কিন্তু উদ্ভিদকে সম্পূর্ণভাবে নিহত করা বেশ শক্ত এবং সবংশে নিধন করা সে তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অহিংসা নীতি একমাত্র উদ্ভিদরাই মনে হয় অত্যন্ত কার্যকরভাবে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলে, এটাই তাদের বেঁচে থাকবার কৌশল। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে উদ্ভিদের আধিপত্য মোটামুটি অব্যাহতই আছে জীব-সৃষ্টির সূচনা থেকে।

উদ্ভিদের জীবন পদ্ধতি বহু বিচিত্র ধারায় এগিয়ে গেছে। এদের কয়েকটি গোষ্ঠী ঠিক অন্যান্যদের মত সর্বজীবের প্রতি নিস্পৃহ, সর্বংসহ নয়; তারা সুযোগ পেলেই ছোট ছোট পোকা মাকড় ধরে হজম করে এটা সত্য। অন্যান্য উদ্ভিদের মত এরাও সূর্যের আলোয় নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে এবং তা সত্ত্বেও ফাঁক পেলে কীট-পতঙ্গ শিকার করে তাদের মাংস হজম করবার সুযোগ হারায় না। খাদ্য বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ এরাই সব থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত জীব।

ঝাঁঝিঃ পতঙ্গভুক উদ্ভিদের নানা প্রজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, আফ্রিকা ও আমেরিকায়

ঝাঁঝি
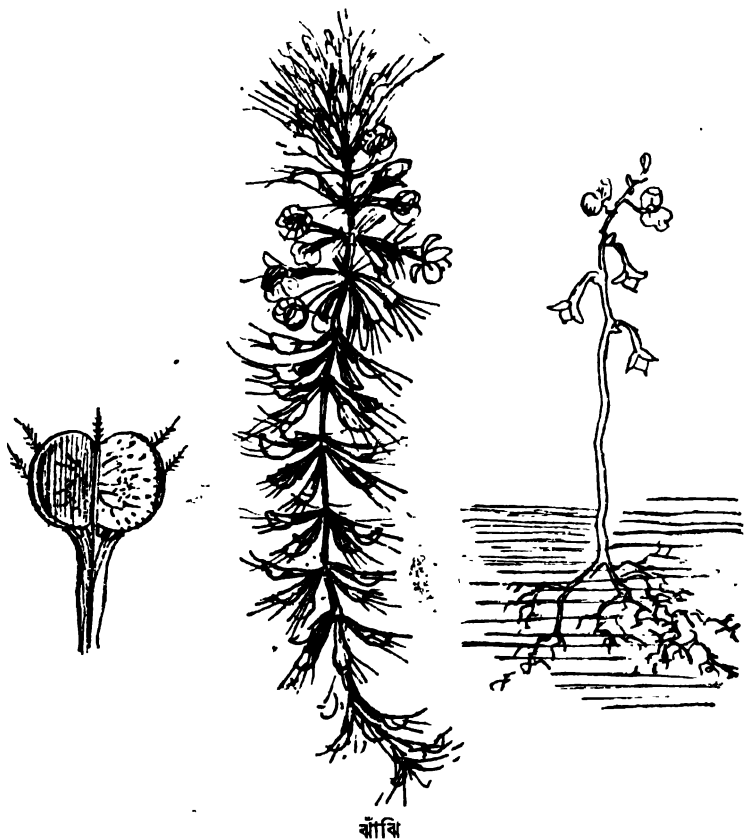
এদের যথেষ্ট আধিপত্য আছে। আমাদের বাংলা দেশের গ্রাম-প্রান্তরে, কলকাতার আশে পাশে এবং আসামের জঙ্গলে কীট-পতঙ্গভুক উদ্ভিদ প্রচুর দেখা যায়। পুকুরে যে সাধারণ বড় ঝাঁঝি (ইউট্রিকিউ লেরিয়া) হয় সেগুলি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। এরা ছোট ছোট জলের পোকা, পোকার পিউপা ও লার্ভা ধরে হজম করে থাকে। এদের পাতা সরু সরু ও কাটা কাটা, এই ছোট ছোট কাটা পাতার মধ্যে থাকে কতকগুলি করে থলি বা ব্লাডার। এই ব্লাডারের মুখে একটি কপাট আছে, ছোট ছোট জলের পোকা অনায়াসে কপাট ঠেলে ব্লাডারের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু পরে আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না,—ভেতর থেকে এ কপাট আর খোলে না, আমৃত্যু তারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে সেইখানেই। তারপর ব্লাডারের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এক রকম পাচক রসে মৃত কীটগুলির দেহ জীর্ণ হতে থাকে এবং উদ্ভিদ ক্রমশঃ তাদের হজম করে ফেলে। এই শ্রেণীর ঝাঁঝিরা লেনটিবিউলেরিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত।

ড্রসেরা : ড্রসেরার নাম অনেকে শুনেছেন। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের একটি প্রজাতি ড্রসেরা। এরা পিঁপড়া, পতঙ্গের লার্ভা প্রভৃতি ধরে হজম করে থাকে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ড্রসেরার দীর্ঘ কেশর ঢাকা পাতাগুলি, প্রত্যেকটি কেশরের প্রান্তে বিন্দু বিন্দু একরকম আঠাল রস জমা হয়, ছোট ছোট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে কেশরের মাথায় বসলেই তাদের পা ও পাখা জড়িয়ে যায় এবং তারা যতই পালাতে চেষ্টা করে ততই আরো জড়িয়ে পড়ে। ড্রসেরার কেশরের রিফ্লেক্স ক্রিয়া

ড্রসেরা

বা উত্তেজনায় সাড়া দেবার পদ্ধতি লক্ষ্য করবার মত। পতঙ্গটি বসবা মাত্র অন্যান্য প্রাণীর অঙ্গ-সঞ্চালনের মত ড্রসেরার কেশরগুলি বেঁকে শিকারকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরে, পাতার ধারে বসলে কেশরগুলি ক্রমশঃ পতঙ্গটিকে পাতার মাঝখানে এনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কেশরগুলি উত্তেজিত হয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, পালাবার পথ সম্পূর্ণ যায় বন্ধ হয়ে। তারপর বিন্দু বিন্দুভাবে ক্ষরিত পাচক রসের সাহায্যে উদ্ভিদ পতঙ্গটিকে জীর্ণ করে ফেলে এবং পরিশেষে ধীরে ধীরে হজম করে ফেলে। হজম শেষ হলে কেশরগুলি আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। পতঙ্গের পরিবর্তে ছোট একটুকরো মাংস বা কোন আমিষ পদার্থ ড্রসেরার কেশরের উপর রাখলে ঠিক এইভাবে তারা উত্তেজিত হয়ে সাড়া দিয়ে থাকে। পরেশনাথ পাহাড়ে যাবার রাস্তায় গিরিডিতে ভিজেমাটির ওপর ড্রসেরা গাছ প্রচুর দেখেছি। বর্ধমানের কাছে শক্তিগড় স্টেশনের মাঠেও ড্রসেরা গাছ শীতকালে কয়েক বছর আগে দেখেছি। ড্রসেরার একটি চলতি নামও আছে—মুখজালি। বাংলা দেশে ড্রসেরার চারিটি প্রজাতি দেখা যায়; এরা ড্রসেরেসী গোত্র-ভুক্ত উদ্ভিদ।

কলস উদ্ভিদ

কলস উদ্ভিদঃ আসামের জঙ্গলের কলস উদ্ভিদ বা পিচার প্ল্যান্ট আর একটি স্বনামখ্যাত কীটভুক উদ্ভিদ। পাতাগুলি লম্বা লম্বা, পাতার ডগাটি দড়ির মত এবং তার প্রান্তে চার থেকে আট ইঞ্চি লম্বা একটি অতি চমৎকার

লম্বা কলস থাকে বসান। কলসের মুখে একটি ঢাকনি থাকে আধখোলা অবস্থায় লাগান, বরাবর একই অবস্থায় ঢাকনিটি থাকে, এর কোন গতি বা মুভমেণ্ট নেই, সাধারণতঃ পতঙ্গের বসবার জায়গা হিসাবেই এটা কাজে লাগে। মধুস্রাবী গ্রন্থিও আছে অনেকগুলি কলসের মুখে। মধুলোভী পতঙ্গরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কলসের ভেতরে প্রবেশ করলে সেখানে তাদের চরম রসিকতার সম্মুখীন হতে হয়। কলসে সঞ্চিত অনন্ত রসে ডুবেই তারা মারা যায়। মানুষ বা জীবজন্তুর পাকস্থলীতে যে রসের সহায়তায় আমিষ জাতীয় আহার্য জীর্ণ হয় এটিও সেই রস—পেপসিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। কলস উদ্ভিদ নিপেন্থাসী গোত্রভুক্ত, এদের জেনাস বা গণের নাম নিপান্থাস।

ভিনাস ফ্লাইট্রাপ : পতঙ্গ শিকারের ব্যাপারে আমেরিকান উদ্ভিদ ভিনাস ফ্লাইট্রাপ সকলকে পিছনে ফেলে প্রায় পশুর স্তরে এসে পৌঁছেচে। এদের পাশবিক আচরণ দেখে উদ্ভিদ জাতি নিশ্চয়ই লজ্জা বোধ করত অবশ্য যদি তাদের লজ্জাবোধশক্তি আদৌ থাকত। ভিনাস ফ্লাইট্রাপের পাতার প্রান্ত ভাগটি বইয়ের মত বা ঝিনুকের খোলার মত দুই ভাগে খোলা ও বন্ধ করা যায়। প্রতিটি ভাগে তিনটি করে কাঁটা আছে, কিনারাগুলি খাঁজ কাটা, কোন কীট বা পতঙ্গ একটি কাঁটা স্পর্শ করলেই পাতাটি দুইভাগে ভাঁজ হয়ে কিনারায় কিনারায় জুড়ে যায়, যার মধ্যে পতঙ্গটি হয়ে যায় বন্দী। তার পরের ইতিহাস একই রকম, অন্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ এবং পাচক রসে গলে গিয়ে উদ্ভিদকে পুষ্ট করা। হজম শেষ হলে পাতাটি আবার দুই ভাগে খুলে যায়। কত বড় প্রাণী পর্যন্ত উদ্ভিদ এই ভাবে শিকার করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সি. জে. হাইল্যাণ্ডার নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন—"একটি ছোট ব্যাঙ"—এটাই হল উদ্ভিদের ধরা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শিকার, কিন্তু তাই বা কম কি!

আলোকলতা : যে উদ্ভিদরা প্রাণী ধরে না কিন্তু অন্য উদ্ভিদের স্কন্ধে আশ্রয় নিয়ে তাকে শোষণ করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় তারাও কম ওস্তাদ নয়। আমাদের দেশের অতি পরিচিত আলোকলতা বা স্বর্ণলতা, বেনেবউ প্রভৃতি পরগাছা এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। আলোকলতার দেহে কোন পাতা নেই, সবুজ কণাও নেই ; তারা সুকৌশলে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের তৈরি খাদ্য আত্মসাৎ করেই জীবনের প্রধানতম সমস্যার সমাধান করে থাকে। আলোকলতা তার ছোট ছোট শিকড়ের মত প্রত্যঙ্গগুলি (হোষ্টোরিয়া) ইঞ্জেকশনের ছুঁচের মত বিঁধিয়ে দেয় অন্য উদ্ভিদের গায়ে, শেষ পর্যন্ত সেটি গিয়ে পৌঁছয় আশ্রয়দাতার খাদ্যনালী অবধি। পুরোপুরি শোষণবৃত্তি তারা এইভাবেই অনুসরণ করে থাকে। আলোকলতার ফুল হয়, ফল হয়, বীজও হয়। বীজগুলি অঙ্কুরিত হয় মাটিতেই, জীবনের প্রথম দিনগুলি আলোকলতা অন্যান্য উদ্ভিদের মত মাটির কোলেই অতিবাহিত করে তারপর কাছাকাছি একটি উদ্ভিদ পেলেই মাটির সংস্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ করে তাকে অবলম্বন করে ওপরে উঠে পড়ে।

র‍্যাফলোসয়া আরণলডি : পৃথিবীতে যে গাছের ফুলটি আকারে সব থেকে বড় সেটিও এই পরগাছা শ্রেণীর উদ্ভিদ। এই গাছটির নাম
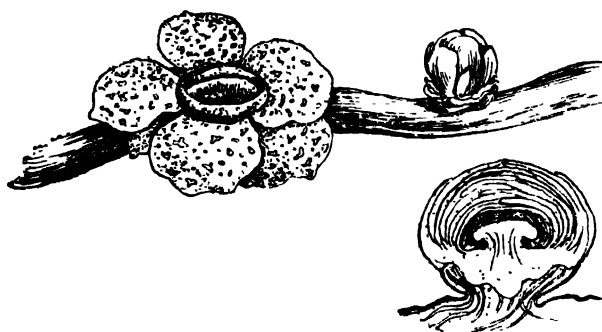
র‍্যাফলেসিয়া আরণলডি

র‍্যাফলেসিয়া আরণলডি, সুমাত্রার জঙ্গলে এটি জন্মায়। গাছ বলতে বিশেষ কিছু নেই ফুলটিই তার সর্বস্ব। র‍্যাফলেসিয়ার বীজ সাধারণতঃ

অন্য গাছের শিকড়ের ওপর অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুরিত হবার পর একটি বলয়ের আকার নিয়ে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে শোষণ করতে থাকে। তারপর এর গায়ে বিরাট ফুটবলের মত একটি কুঁড়ি ধরে এবং সেটি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে দেড় থেকে তিন ফুট ব্যাস এবং সাত-আট সের ওজনের একটি বিরাট ফুলে পরিণত হয়। ফুলের মোটা মোটা পাঁচটি পাঁপড়ি, গন্ধ পচা মাংসের মত, যা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন খাতে এগিয়ে যাবার সময় উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে বহু বিচিত্র ধারায়। কতকগুলি উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়ার বিস্ময়কর বিবর্তনের ফলে কতকগুলি অতি তীব্র বিষ ফলের মধ্যে, বীজের মধ্যে অথবা পাতার আঠায় সঞ্চিত হয়। বিষগুলি প্রত্যক্ষভাবে গাছের কোন ক্ষতি না করলেও পরোক্ষভাবে মানুষ ও জীবজন্তুর ক্ষতি করে যথেষ্ট। ঔষধ হিসাবেও অবশ্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়। আমাদের পরিচিত আফিম গাছের (পাপাভার সোমনিফেরাম) কাঁচা ফলের আঠা থেকে আফিম এবং মরফিয়া বিষ উৎপন্ন হয়। বেলাডোনা গাছ (অ্যাট্রোপা বেলাডোনা) থেকে এট্রপিন এবং বেলাডোনা ঔষধ তৈরি হয়, অধিক মাত্রায় এগুলি বিষের কাজ করে। ঐতিহাসিক বিষবৃক্ষ বিখ্যাত নাইটশেড গাছ (কোনিয়াম ম্যাকুলাটাম) সুতীব্র হেমলক বিষ সঞ্চিত করে দেহের মধ্যে। পূর্বে গ্রীস দেশে বন্দীদের হত্যা করা হত এই হেমলক বিষ পান করতে দিয়ে। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে এই বিষ পান করতে দেওয়া হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। আমাদের ধুতুরা গাছ বিষাক্ত ডাটুরিন সঞ্চয় করে বীজের মধ্যে। কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে কেমন ভাবে এই সব তীব্র হলাহল উদ্ভিদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত হয় তার রহস্য বৈজ্ঞানিকের কাছে আজও পরিষ্কার হয়নি।

অতি প্রাচীন যুগের গাছ সাইকাড। তাদের একটি প্রজাতির নাম ম্যাক্রোজেমিয়া মুরী, তারা আজ পৃথিবী থেকে চরম অবলুপ্তির

মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের নামমাত্র কিছু কিছু বংশধর কোন-মতে টিকে আছে অষ্ট্রেলিয়ার পশুচারণ ভূমিতে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই গাছটির পাতায় একরকম তীব্র বিষ সঞ্চিত হয়, গবাদি পশু সেই পাতা খেয়ে পক্ষাঘাতে মারা যায়। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেণ্ট আর্সেনিক বিষ দিয়ে এই প্রজাতিটিকে সবংশে ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের এই বিষে বিষক্ষয় করার নীতিকে অনেকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমেরিকার বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ জে. জে. চেম্বারলেন অন্যতম, তিনি বাইবেলের নোয়ার প্রজাতি সংরক্ষণ তত্ত্ব অনুধাবন করে এই গাছটির কয়েকটি চারা আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে সযত্নে রোপণ করেছেন।

মাটির বৈগুণ্যে অনেক গাছের দেহের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়। মাটিতে সেলিনিয়াম ধাতুর আধিক্য ঘটলে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পাতায় এই ধাতুঘটিত একটি বিষ সঞ্চিত হয় এবং তৃণভোজী পশুরা সেই বিষাক্ত পাতা খেয়ে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় এই ব্যাধির (অ্যালকালি রোগ) প্রকোপ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আট

আমাদের নিজস্ব ভাবধারা, রসবোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের দেশের যে বৃক্ষলতা ও পুষ্পগুলি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি অনুপম ছবি আঁকা আছে আমাদের দেশের প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে প্রসাধনকলার অপরিহার্য আঙ্গিকরূপে পরিগণিত হত লোধ্ররেণু, অগুরু, চন্দন, কর্ণিকার ও কুরুবকের ফুল। কালিদাসের কালে কুবলয়, পুণ্ডরীক, অরবিন্দ, ইন্দীবর ও কহ্লার ছিল নারীদের পরম বাসনার ধন। অশোক, শিরীষ, নবমালিকা, নীলোৎপল ও আম্রমঞ্জরীর আবেশ-

বিহ্বল সৌরভ ও সৌন্দর্যের মাঝে লুকিয়ে থাকত মদনদেবের পঞ্চ-শরের কলাপ, দূর বেত্রবতী নদীর তীরে বিদিশানগরীর উপবনে শিংশপা অথবা সাল্লকীর ছায়াতলে বিশ্রামরত নায়ক-নায়িকার হৃদয় তারা রাঙিয়ে তুলত নিজ রূপের প্রতিচ্ছায়ায়। কেতকী, কোবিদার, পাটল, পুন্নাগ প্রভৃতি ফুল সগৌরবে বহন করত সে যুগের এইসব বরবর্ণিনীদের রুচি ও রসবোধের মানদণ্ড।

নীপ, চম্পক, বান্ধুলি এককালে রাজত্ব করেছিল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকবিদের অন্তরে। কিন্তু আজ তাঁরা কোথায়? বহু বিরহমিলনের দূতী এই অপরূপ ফুলগুলি তো পরিবেশ আলো করে আজও ফুটে থাকে আমাদের বনে-উপবনে! তবে কদম্বকে বর্জন করে কেন আমরা তুলে নিয়েছি কসমসকে, বান্ধুলিকে বিমুখ করে কেন স্থান দিয়েছি ডালিয়ার? তার সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। আমাদের বর্তমান রসবোধ সম্পর্কে আমার ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে একথা বলা যায় এইসব ফুল যদি আমরা আজও হাতের কাছে পাই তাহলে পূর্বের মতই সমাদর করে তুলে নিতে উৎসুক আছি।

প্রাচীন কবিদের মধ্যে কালিদাসই মনে হয় সব থেকে প্রকৃতি-সচেতন কবি ছিলেন। বৃক্ষের দেবত্ব এবং মহত্ত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টির উপকরণ হিসাবে তিনি বৃক্ষলতা এবং নানারকম ফুলকে যত বিচিত্রভাবে এবং যত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে একান্তই বিরল; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের কথা স্মরণ রেখেই একথা বলা যায়। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কালিদাসের কাব্যে ফুল' গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, প্রায় একচল্লিশ রকমের ফুল মহাকবি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কাব্যে। সংখ্যা-তত্ত্বের দিক থেকে এই সংখ্যাটি নিতান্তই নগণ্য, আমাদের দেশে যেসব গাছে ফুল ফোটে তাদের সংখ্যাই প্রায় চোদ্দ হাজারের মত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় সে যুগের নামকরা ফুলগুলি ছাড়াও ভদ্রমুস্ত

(কাশ), বেতস (বেত), সপ্তচ্ছদ (ছাতিম), এমনকি শিলীন্ধ্রা, কন্দলীর (বেঙের ছাতা? ভুই চাঁপা?) মত সাধারণ উদ্ভিদও কালিদাসের কাব্যের ভাব ও সৌন্দর্যবিকাশের সহায়তা করেছিল।

সকল ফুলের মধ্যে পদ্মই ছিল সে যুগের পুষ্পরাজ। মহর্ষি বাল্মীকি নীলপদ্মের সঙ্গে রামচন্দ্রের চোখের তুলনা করেছিলেন, সম্ভবতঃ সেই থেকে এক স্বতন্ত্র আভিজাত্য নিয়ে পদ্ম ভারতের জাতীয় মানসে ধরা দিয়েছে। পদ্মিনী থেকে পদ্মভূষণ পর্যন্ত সকল যুগেই পদ্ম সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, তবু সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে পদ্মের সৌন্দর্যের দাবী প্রশ্নাতীত নয়।

পদ্মের সৌন্দর্য যা কবির লেখনীতে ও শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে তার বেশীর ভাগই কাল্পনিক, তবু আমাদের দেশে ঐতিহ্যের প্রশ্নে পদ্মের স্থান অন্য কোন ফুলের পেছনে হতে পারে না, এটা ঠিক।

কর্ণিকার-কুরুবক-কুটজ-কোবিদার-কদম্ব ঃ বসন্তের শেষ দিনগুলি সুধায় ভরিয়ে রাখে কর্ণিকারের ফুলগুলি। সোনালি ঝর্ণার মত হলুদ ফুলের স্তবকগুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে দোলে শাখার প্রান্তে প্রান্তে, সেই দৃশ্যে অতিবড় উদাসীনও মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না। আমাদের গ্রামপ্রান্তরে কর্ণিকারের ফুল আজও ফোটে অজস্রধারে, এর চলিত নাম সোঁদাল বা বানরছড়ি, ল্যাটিন নাম ক্যাসিয়া ফিশ্চুলা। প্রাচীনকালে সোনালি কর্ণিকার নারীদের

কর্ণিকার

পরম সমাদরের সামগ্রী ছিল। তাঁরা মেঘবরণ কেশে সৌদামিনীর শোভা সৃষ্টি করতেন সোনালি কর্ণিকারের ফুল তুলিয়ে।

কুরুবক বসন্তের ফুল, ঋতুরাজের দূত হয়ে দেখা দেয়; ছোট ছোট বকফুলের মত আকৃতি, রক্তবর্ণ পাপড়ি, স্তবকে স্তবকে অজস্র ফোটে বসন্তবিহ্বল বনে। ঝান্টি বা ঝাঁটি এই নামে আজ এদের জানি, আদর বিশেষ আজ এদের নেই। কুরুবক শুঁটী জাতীয় গাছ, পলাশ, অপরাজিতার সগোত্র। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিদের অতি প্রিয় ছিল এই ফুলটি। সেকালের সুন্দরীরা এই ফুলে কবরী সাজাতেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এর নাম সেসবেনিয়া সেসবেন।

পুরাণে আছে ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত দিয়ে জীবিত করেন, তখন হনুমানের গা থেকে এক ফোঁটা অমৃত ভূ-পৃষ্ঠের ওপর পড়ে, তা থেকেই একটি অতি সুন্দর গাছ জন্মায়, এই গাছটির নাম কুটজ বা আমাদের পরিচিত কুর্চি। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে কুটজের রূপ ও গুণের সুখ্যাতির অন্ত নেই। এই গরবিনী ফুলটি দেখতে ছোট ছোট টগর ফুলের মত, অতি মিষ্টি গন্ধ, যে গন্ধ এক মধুর বেদনার মত প্রাণের প্রতিটি তন্ত্রীকে অবশ করে রাখে। আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর কুর্চি গাছ জন্মায়, হিমালয়ের কোলেও প্রচুর কুর্চি গাছ দেখা যায়, সম্ভবতঃ সেইজন্য এর আর এক নাম গিরিমালিকা। বর্ষাকালে কুর্চির ফুল ফোটে। সংস্কৃত গ্রন্থে ছালের রং হিসাবে দুই রকম কুটজের কথা বলা হয়েছে, শ্বেত কুটজ ও কৃষ্ণ কুটজ, এদের বীজের নাম কৃষ্ণযব। কুটজের ছাল আমাশার একটি চমৎকার ওষুধ, বস্তুতঃ এই জন্য কুটজের ল্যাটিন নাম দেওয়া হয়েছে হোলারহেনা অ্যান্টিডিসেন্ট্রিকা। এরা অ্যাপোসাইনেসী গোত্রের অন্তর্গত।

কুটজ

আমাদের পরিচিত ফুল কাঞ্চনের রাশভারী সংস্কৃত নাম

কোবিদার। এই নামেই কাব্যগ্রন্থে এরা সমাদৃত। সাদা, লাল, হলুদ, ফিকেবেগুনী—কয়েক জাতের কাঞ্চন গাছ দেখা যায়। কলকাতার পার্কে এরা শাদা ফুলের ডালি সাজিয়ে রাখে বর্ষায় ও বসন্তে। শরৎ ও হেমন্তে ফুল ফোটে কয়েক জাতের গাছে। কাঞ্চনের পাতা যৌগিক, দুটি সরল পত্র পাশাপাশি জুড়ে এটি গঠিত। এই গাছের আর একটি নাম কাঞ্চনর। অতি বিরাট আকারের লতাকাঞ্চন দেখা যায় আসামের জঙ্গলে যার নাম বনরাজ। এরা শুঁটী জাতীয় গাছ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এদের নাম বাউহিনিয়া।

কোবিদারের নামের সঙ্গে আর একটি ফুলের নাম মনে পড়ে তা কদম্ব। ঐতিহ্য ও রূপের গভীরতায় কদম্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে আমাদের দেশে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই ফুলটি ফোটে। বর্ষায় যখন রঙের বাহার বিরল হয়ে পড়ে, তখন এরা ফোটে থোকায় থোকায় অজস্রধারে। শিশু অবস্থায় কদম্বের গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, বছরে প্রায় সাত-আট ফুট করে। দুই জাতের কদম্ব দেখা যায়, আসল নীপ বা কদম্ব (অ্যানথোসেপেলাস ইণ্ডিকাস্) এবং কেলি কদম্ব বা ধূলি কদম্ব (অ্যাডিনাসালিস করডিফোলিয়া)। কালিদাসের কাব্যে কদম্বের এই শ্রেণীগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে আমরা বিশ্বাস করতাম কদম্বের গন্ধ বয়ে আনে প্রবাসী প্রিয়জনের বার্তা। বর্তমানে আমাদের নব্য রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনায়াসে এই সুন্দর ফুলটির স্থান করে দিতে পারি আমাদের গৃহকোণে অথবা মেয়েদের কবরীতে। একটি প্রশংসনীয় সংযোজন হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

অগুরু : অগুরু, চন্দন, চুয়া, লোধ্ররেণু এবং কুঙ্কুম ছিল প্রাচীন যুগের ললনাদের প্রিয় অঙ্গরাগ। অগুরুর ধুনা যখন মোমের মত গলে গলে অনির্বচনীয় সুগন্ধে ভরিয়ে তুলত বাতাস, তখন উজ্জয়িনীর নায়িকা সেই গন্ধধূমে শোধিত করে নিত ঘনমেঘের মত কাল কেশের রাশি। অগুরু গাছ চিরসবুজ, বেশ লম্বা আকারের

গাছ, গ্রীষ্মকালে শাদা রঙের ছোট ছোট অজস্র ফুল ফোটে, ফল পাকে বর্ষায়। অগুরুর ছাল পাতলা খসখসে, ভেতরের ছাল আরো পাতলা পার্চমেণ্ট কাগজের মত। প্রাচীন যুগে আসামের নৃপতিরা এই কাগজের ওপর কাব্য লিখতেন এবং ফতোয়াও জারি করতেন। অগুরু কাঠ সুগন্ধময়, এই কাঠ পরিশোধিত করে প্রস্তুত হয় মূল্যবান অগুরুর আতর। ভারতের বহুলোক আজও ব্যবহার করে এই আতরটি আদর করে। অগুরুর সুগন্ধ কাঠ দিয়ে গহনার বাক্স তৈরি হয়। রাজনির্ঘণ্টুর মতে অগুরু গাছ চার রকমের, কৃষ্ণ-অগুরু আসামের জঙ্গলে জন্মায়, পীতবর্ণের কাষ্ঠ-অগুরু ও দাহ-অগুরু গুর্জর প্রদেশে জন্মায় এবং মঙ্গল-অগুরু কেদারে পাওয়া যায়। আসামের কৃষ্ণ-অগুরুই শ্রেষ্ঠ। শ্রীহট্টের শ্রেষ্ঠ অগুরুর নাম ঘড়কী। হিন্দীতে অগুরুর ধুনাকে আগর বলে, এই থেকে ধূপ বা আগর-বাতি তৈরি হয়। অগুরুর ইংরাজী নাম অ্যালোউড। অধ্যাপক সহায়রাম বোস বলেন অগুরু গাছের ধুনা তৈরি হয় গাছের মধ্যে বসবাসকারী একশ্রেণীর ছত্রাকের সহায়তায়, তারা শরীর থেকে যে জারকরস নিঃসৃত করে তারই ক্রিয়ায় গাছের ছালের সৌগন্ধময় আঠা বা মধ্যে ধুনার উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অগুরু গাছের নাম অ্যাকুইলারিয়া অ্যাগালোচা, এরা সাইমেলিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত। ভারতবর্ষ ছাড়া ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে অগুরু গাছ প্রচুর পাওয়া যায়।

অগুরু

চন্দনঃ অগুরুর সঙ্গে চন্দনের নাম জড়িয়ে আছে সুনিবিড়ভাবে। প্রাচীন যুগে দয়িত এবং দেবতা দুইয়েরই মনোরঞ্জনের জন্য চন্দনের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। অনেক বেশী পরিমাণে চন্দন তখন আমরা

ব্যবহার করতাম। চন্দন সেই শ্রেণীর গাছ যারা সাধারণতঃ অন্য গাছের শিকড়ের উপর বা ডালের উপর আশ্রয় নিয়ে আংশিকভাবে পরগাছার জীবন কাটায়। মাঝারি আকারের চিরসবুজ গাছ। পাতা সরু ও লম্বা লম্বা। আশ্চর্যের বিষয় চন্দনগাছের ফুলে, ফলে, পাতায় কোন সুগন্ধ নেই, এর যত সৌরভ সঞ্চিত কাঠে ও শিকড়ে। চন্দন-গাছের বাহিরের কাষ্ঠের (sapwood) রং সাদা এবং গন্ধশূন্য, ভেতরের কাঠ ধূসর রঙের এবং সৌগন্ধময়। পরিস্রুত চন্দনকাঠ থেকেই চন্দনতেল উৎপন্ন হয়। কাঠের চেয়ে চন্দনগাছের শিকড় থেকেই বেশী পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। তিরিশ বছরের কম বয়সী কোন গাছ থেকে সাধারণতঃ ভাল চন্দনতেল বা কাঠ পাওয়া সম্ভব নয়। চন্দন হতেই চুয়া তৈরি হয়, প্রসাধন কলায় চুয়ার একটি বিশেষ স্থান ছিল প্রাচীন যুগে। উড়িষ্যা দেশে পানের সঙ্গে চুয়ার ব্যবহার প্রচলিত। চন্দনের ফুল ছোট ছোট, প্রচুর ফোটে, কুঁড়ির রং ফিকে

চন্দন

পীতবর্ণের, পরে পরিবর্তিত হয়ে যায় বেগুনী রঙে। ফল গোলাকার ও মসৃণ, পরিপক্ক ফলের রং কাল। প্রাচীন গ্রন্থে তিন রকম চন্দনের

উল্লেখ আছে, শ্বেত-চন্দন, পীত-চন্দন এবং রক্ত-চন্দন। শ্বেত-চন্দন গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ। মলয় পর্বতের কাছে যে চন্দনগাছ জন্মায় সংস্কৃত কাব্যে তার একটি বিশেষ নাম আছে—ভদ্রশ্রী। শ্বেত-চন্দনের আরও পাঁচটি নাম পাওয়া যায় সংস্কৃত গ্রন্থে—সুক্কর, বর্বর, তৈলপর্ণ, বেটট ও গোশীর্ষ। বাংলাদেশে রক্ত-চন্দনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। রক্ত-চন্দন আসলে ঠিক চন্দন গাছ নয়, এরা শুঁটী জাতীয় গাছ, পলাশ অপরাজিতার সগোত্র, এদের ডাল থেকে নিষ্কাশিত লাল রং বাজারে রক্ত-চন্দন নামে বিক্রি হয়। মহীশূর রাজ্যেই আসল শ্বেত-চন্দন গাছ সব থেকে বেশী জন্মায়, এই রাজ্যে চন্দনের তেল থেকে সাবান, ধূপ, সুরভি ও চন্দন কাঠের আসবাব ও বাক্সের এক বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ ছাড়াও চন্দন গাছ মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে চন্দনের নাম সান্তালাম আলবাম এরা সান্তালেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নয়

দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের অতুলনীয় বৈভব চার্লস ডারউইনের চিন্তারাজ্যে সর্বপ্রথম যে সন্দেহের বীজ রোপণ করেছিল তা হচ্ছে—আজ যে-সব উদ্ভিদ আমরা চোখের সামনে দেখছি তারা সৃষ্টির সূচনা থেকে বরাবর কি একই রূপ নিয়ে টিকে আছে? না, কালে কালে তাদের বৈশিষ্ট্য পাল্টে গেছে, নূতনতর প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে? অভিযাত্রী দলের সঙ্গে জাহাজে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল বরাবর পরিভ্রমণ করবার সময় চার্লস ডারউইনের মনে একদা এই সব চিন্তা জড়ো হয়েছিল। নিত্য যত অজস্র ফুল ফোটে প্রকৃতির প্রাঙ্গণে তাদের মধ্যে ক'টি পূর্ণের পরশ পায়? ক'টির বীজ ফুলে ফলে শোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়? জীবনের কত অজস্র অপচয় ঘটে প্রকৃতির মাঝে এবং সেই অবিরাম মৃত্যুর মাঝে জীবনের

প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কী নিষ্করুণ হিংস্র সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপাত প্রশান্ত প্রকৃতির বুকে! প্রকৃতির এই বাছাই-বর্জনের লীলার মাঝে নূতনতর রূপ পরিগ্রহ করে জীব উন্নততর প্রজাতির জন্ম দিয়ে। এ. আর. ওয়ালেসের সঙ্গে চার্লস ডারউইনের জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় এই জাতীয় মতবাদ সর্বপ্রথম পঠিত হয় লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির মিটিংএ, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে। চার্লস ডারউইন নিজে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ডারউইনের বিশিষ্ট বন্ধু স্যার জে. ডি. হুকার, যিনি ভারতবর্ষের উদ্ভিদ নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন, তিনি ছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধের বক্তব্য শোনবার পর মন্তব্য করেছিলেন : The subject was too novel and too ominous for the old school to enter the lists before armoring.

ডারউইন-ওয়ালেসের মতবাদ আজ জগৎ বিখ্যাত। ডারউইনের পরও প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের সূত্র অন্বেষণের জন্য বহু বিখ্যাত পণ্ডিত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, তাঁরা জীবাশ্মতত্ত্ব, ভ্রূণ-তত্ত্ব, অ্যানাটমি ও কোষবিদ্যার সাগর মন্থন করে বহু তথ্য ও নজীর খাড়া করে ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের পরস্পরের অনুসৃত মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁরা একমত। উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা বলেন, মানুষ যেমন সকল প্রাণীর মধ্যে সর্বোন্নত সংস্করণ, উদ্ভিদ রাজ্যের তেমনি কুলচূড়ামণি হল সূর্যমুখী বা গাঁদা জাতীয় গাছেরা। ক্রমবিকাশের ধাপ বয়ে বয়ে সর্বোন্নত স্তরে তারা আজ এসে পৌঁছেছে। প্রোটোজোয়া থেকে মানুষের আবির্ভাব কালের ব্যবধান যত বেশী, ব্যাকটেরিয়া থেকে সূর্যমুখীর ব্যবধান অনেকটা তারই মত। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিকের হাতে আজ নেই। বহু যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, ব্যাকটেরিয়া থেকে সবুজ শেওলা, তা থেকে ব্রায়োফাইট, ফার্ণ ও

সাইকাস জাতীয় গাছ এবং তারপর যুক্তভাবে একদল-বীজ ও দ্বিদল-বীজ রূপের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের বিবর্তন ঘটেছে। মূল বিবর্তনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক গোষ্ঠীর উদ্ভিদ যেমন ছত্রাক, কয়েক জাতের শেওলা ও উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জাতের উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটেছে সমান্তরাল স্বতন্ত্র কতকগুলি ধারায়। এই ক্রমবিবর্তনের সূত্র অন্বেষণ করেই আধুনিক যুগে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ে এঙ্গলার, বেসি, হাচিনসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা নূতন দিগন্তের সন্ধান এনে দিয়েছেন।

উদ্ভিদ জীবনের ব্যাপকতা ও সমগ্রতার তাৎপর্য অনুভব করতে হলে তার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা অনুধাবন করা প্রয়োজন। বট, অশ্বত্থের মত চেনা ও জানা উদ্ভিদ ছাড়াও বহু শ্রেণীর উদ্ভিদ বিস্ময়কর বৈচিত্র্য নিয়ে রয়েছে আমাদের চারিপাশে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কী সম্পর্ক, কী কুটুম্বিতা? তারই হদিস এনে দেয় এই তত্ত্ব।

ক্যাকটাসঃ বট, অশ্বত্থের মত ক্যাকটাস দ্বিদল-বীজ গোষ্ঠীর উদ্ভিদ হলেও এদের জীবনের বৈশিষ্ট্য এত স্বতন্ত্র যে সহজেই এরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত, কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন সন্ন্যাসীর মত এরা কাঁটার মুকুট পরে শুষ্ক প্রাণহীন প্রান্তরে জীবনের নিশানা বহন করে নিয়ে যায়। উত্তাপের আধিক্য ও জলের স্বল্পতায় এরা আশ্চর্যরকম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে থাকে। এদের শিকড়ের দৈর্ঘ্য ও ব্যাপ্তি সাধারণ উদ্ভিদের থেকে অনেক বেশী। গভীর গোপনে মাটির তলায় যে জল থাকে এরা তা শোষণ করে সঞ্চয় করে রাখে নিজেদের স্ফীত ডালপালাগুলির মধ্যে। তাই মাটি থেকে ক্যাকটাসকে তুলে সম্পূর্ণ শুষ্ক পাত্রে রেখে দিলেও বহুদিন পর্যন্ত এরা সজীব অবস্থায় থাকে। জলের অনিবার্য অপচয় হ্রাস করবার জন্য এদের শরীরেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে।

স্যার জে. ডি. হুকার লিখেছেন, পৃথিবীতে প্রায় এক হাজার প্রজাতির ক্যাকটাস আছে। এদের মধ্যে দু-একটি প্রজাতি

ছাড়া আর সকলেই আমেরিকার আদি বাসিন্দা। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন ক্যাকটাস নেই। আমাদের মাঠে-ঘাটে, জঙ্গলে যে অজস্র কাঁটাভরা ফণীমনসার গাছ দেখা যায় তারা আসলে ক্যাকটাসই, কিন্তু এদেরও আদি জন্মস্থান আমেরিকায়। বহু বছরের চেষ্টায় ফণীমনসা আজ চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে আমাদের দেশের জলবায়ুর সঙ্গে। রক্সবারো সাহেব ভারতে ফণীমনসার বংশবিস্তারের প্রাচুর্য দেখে এক সময় ভেবেছিলেন, এরা খাঁটি ভারতীয় উদ্ভিদ এবং নাম দিয়েছিলেন ক্যাকটাস ইণ্ডিকাস অর্থাৎ ভারত-বর্ষের ক্যাকটাস, কিন্তু পরে তাঁর ভুল ভাঙ্গে, এদের প্রকৃত নাম হল ওপানথিয়া ডিলেনী। পর্তুগীজরা এদের এনেছিল আমেরিকা থেকে। ফণীমনসা বাংলা-দেশ, মহীশূর ও সিন্ধু প্রদেশে এত অজস্র পরি-মাণে জন্মায় যে গত শতকে সরকারী তরফ থেকে ফণীমনসার ফল থেকে সস্তায় মদ তৈরি করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে স্পেনে এই জাতীয় গাছের ফল থেকে ভাল মদ তৈরিও হয়ে থাকে, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এই সিদ্ধান্ত পরে পরিত্যক্ত হয়।

ক্যাকটাস

আমাদের দেশের নিজস্ব ক্যাকটাস একটিও না থাকলেও গত দেড়'শ-দু'শ বছরের মধ্যে বহু প্রজাতির ক্যাকটাসের আমদানি

ঘটেছে আমাদের দেশে, তারা আমাদের দেশের বাগিচা, নগরীর সবুজ কোণগুলি ও ক্যাকটাস রসিকের আঙিনাকে ভরিয়ে তুলেছে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ গাছ দেখতে সব থেকে সুন্দর? এই বিচিত্র জিজ্ঞাসার উত্তরে সবথেকে বেশী লোক ক্যাকটাসের দিকেই আঙুল তুলে দেখিয়েছিল কয়েক বছর আগে আমেরিকাতে। উদ্ভিদের রূপের যে কত অনুপম বৈচিত্র্য ঘটতে পারে তা ক্যাকটাস রসিকের আঙিনায় একবার না এলে অনুভব করা সত্যই কঠিন। সূক্ষ্ম জ্যামিতিক মাপের তিন-কোণা, চার-কোণা বা বৃত্তাকার দেহ অংশ-গুলি এবং তার ওপর নিখুঁত গাণিতিক সামঞ্জস্য অনুযায়ী বর্ণ, রেখা ও কাঁটার যে সূক্ষ্মতম কারুকার্য দেখা যায়, তার তুলনা অন্য কোন উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরল। ক্যাকটাসের দেহের প্রতিটি বিন্দুই দর্শনীয়, এই দেহের ওপর প্রজাপতির মত রঙিন একটি-দুটি যখন ফুল ফোটে তখন এই তিলোত্তমার যৌবন-লাবণ্য পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এক দুর্লভ মাধুর্যে।

মানুষের কুশলী হাতের কল্যাণে বহু বিচিত্র ভ্যারাইটির ক্যাক-টাসেরও সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির বুকে বিস্ময়কর স্থাপত্যের নিদর্শন-স্বরূপ ৩০-৪০ ফুট উঁচু বিরাট জাতের ক্যাকটাস আছে, আবার মানুষের হাতের কল্যাণে একটি ছোট্ট, অপূর্ব কারুকার্যময় মুক্তার মত ক্যাকটাস যা অনায়াসে একটি ঝিনুকের খোলার মধ্যে পালন করা চলে তাও আছে। সব ক্যাকটাসের দেহেই যে কাঁটা
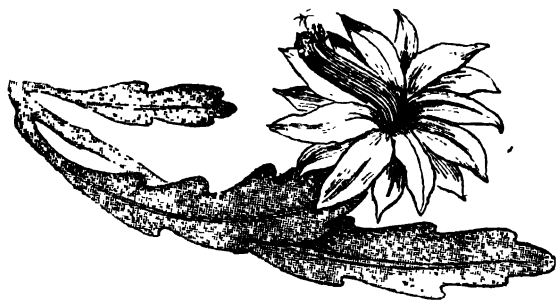
অর্কিড-ক্যাকটাস

থাকে তা নয়, সম্পূর্ণ কাঁটাশূন্য কয়েক জাতের ক্যাকটাসও পাওয়া

যায়। কতকগুলি আবার অর্কিডের মত অন্য গাছের ডালের ওপর বসবাস করা পছন্দ করে। তাদের কাণ্ড চ্যাপ্টা, ফিতার মত, ৩।৪ ইঞ্চি চওড়া ও ২০।৩০ ফুট লম্বা। এদের নাম অর্কিড-ক্যাকটাস। সাধারণতঃ ক্যাকটাসের বাড় খুবই ধীরে-সুস্থে হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর অর্কিড-ক্যাকটাস খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। গেছো পিঁপড়ের সঙ্গে এই জাতীয় ক্যাকটাসের এক বিচিত্র সহ-অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। গেছো পিঁপড়েরাই এদের বীজের বিস্তার ঘটায়। অরণ্যের মধ্যে পিঁপড়েরা এক গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে এনে অন্য গাছের গায়ে বপন করে এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত হলে তারা নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে দেয় ক্যাকটাসের লতানো ডালপালাগুলিকে আশ্রয় করে।

অর্কিড : যদি একটি মাত্র ফুলের রূপে ভুবন ভোলান যায় তবে সে ফুলের নাম অর্কিড। অর্কিড ফুলের বিপুল আভিজাত্য গৌরব আজ পৃথিবীর সকল দেশেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। উদ্ভিদ সমাজে কুলগৌরবেও অর্কিডের আসন বেশ উঁচুতে, সূর্যমুখীর পাশেই। সূর্যমুখীর মতই অর্কিডের রূপ-বৈশিষ্ট্য ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ সাধনার সর্বশেষ সিদ্ধি। তফাত শুধু এই— সূর্যমুখী দ্বিদল-বীজ আর অর্কিড একদল-বীজ উদ্ভিদ।

অর্কিড

স্যার জে. ডি. হুকার লিখেছেন—পৃথিবীতে ৩৪০টি গণ এবং প্রায়

৫০০০ প্রজাতির অর্কিড আছে। ভারতবর্ষে ১১৩টি গণের অর্কিড পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অতি পরিচিত রাস্না (ভেণ্ডা রক্সবার্গী) এই জাতীয় উদ্ভিদ। অর্কিডের ব্যাপক আধিপত্য দেখা যায় গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের জঙ্গলে, যেখানে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়, ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালায় আকাশ থাকে ঢাকা, সেই স্যাঁতসেতে, আধো অন্ধকার অরণ্যে নানা বিচিত্র জাতের অর্কিড অন্য গাছের ডালের ওপর বাহারি ফুলের পসরা সাজিয়ে রাখে। আমাদের দেশে হিমালয়ের তলায়, আসামে এবং দাক্ষিণাত্যে অজস্র অর্কিডের সমাবেশ দেখা যায়। অর্কিড অন্য গাছের ওপর আশ্রয় নিলেও আলোক লতার মত আশ্রয়দাতাকে শোষণ করে কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয় না। অর্কিডের কতকগুলি শিকড় বাতাসে ঝোলে, তার গায়ে ভেলামেন নামে এক আস্তরণ থাকে জড়ান। ব্লটিং পেপারের মত এই ভেলামেন বাতাস থেকে জল শোষণ করে নিয়ে অর্কিডকে সহায়তা করে তা জমিয়ে রাখতে স্ফীত কাণ্ড ও পাতাগুলির মধ্যে। দীর্ঘকাল জল না পেলেও অর্কিডের তাই কোন অসুবিধা হয় না। অর্কিডের এই বৈচিত্র্যের জন্যই আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অর্কিডের চালান খুব সহজ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই ক্যাটলিয়া জাতীয় বিশ্ববিশ্রুত অর্কিডের আবিষ্কার একদিন সম্ভব হয়েছিল। এই সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনার কথা শোনা যায়। গত শতকের প্রথম দিকে সইনসন নামে এক উদ্ভিদবিদ ব্রাজিলের অজ্ঞাত অরণ্য প্রদেশ থেকে প্রচুর মস ও লাইকেন সংগ্রহ করে এনে ছিলেন ইংলণ্ডে। তিনি দড়ির অভাবে মসের তাড়াগুলি বেঁধেছিলেন অপরিচিত একটি লতার সাহায্যে, এই লতাটি ছিল ক্যাটলিয়া জাতীয় অর্কিডের অংশ। দীর্ঘ আট-মাসব্যাপী সমুদ্র যাত্রার দুরবস্থায় এবং অনাহারে এই লতাটি তার প্রাণশক্তি কিছুমাত্র হারায় নি। সৌভাগ্যক্রমে বাণ্ডিলটি গিয়ে পড়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত উদ্যানতত্ত্ববিদ উইলিয়াম ক্যাটলির হাতে, তিনি ভিতরের জিনিসের পরিবর্তে বাণ্ডিল বাঁধা দড়িটির ওপরই বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং

তাঁরই হাতে ও ডক্‌টর লিণ্ডলের পর্যবেক্ষণে সভ্য জগৎ সর্বপ্রথম ক্যাটলিয়ার ফুলের অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিল। বলাবাহুল্য উইলিয়াম ক্যাটলির নাম অনুসারেই এই অর্কিডটির নাম হয়েছে।

অর্কিডরা সাধারণতঃ অন্য গাছের ওপর বসবাস করলেও মাটিতে আজন্মকাল বাস করে এমন জাতের অর্কিডও কতকগুলি আছে, তাদের বলে গ্রাউণ্ড অর্কিড; এদের ফুলও দেখতে সুন্দর। অর্কিডের ফুল ফোটবার কোন নির্দিষ্ট ঋতু নেই। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন ঋতুতে এদের ফুল ফুটে থাকে। আশ্চর্য ফুল অর্কিড, এর রূপের খ্যাতি ও রূপমুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা দুইই আজ অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে চলেছে পৃথিবীতে। অর্কিডের ফুলের গঠন কিন্তু খুবই সরল, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদিও তার বিন্যাস খুবই উচ্চস্তরের। ফুলের মাঝে জিহ্বার মত বিস্তৃত, বড় একটি পাপড়ি, যার কোমলতা ও প্রগলভ বর্ণচ্ছটার সঙ্গে অন্য কোন ফুলের তুলনা হতে পারে না। এই পাপড়ির দুই পাশে কর্ণের মত প্রসারিত দুইটি পাপড়ি আছে যাদের বর্ণের অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষ্য করবার মত। এদের ঠিক পেছনে তারকার মত তিনটি দল ফুলের সরলতা ও আভিজাত্যকে একই সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে।

প্রকৃতির বুকে পতঙ্গের সাহায্যেই অর্কিডের পরাগ সংযোগ ঘটে। আজ মানুষের হাতের কল্যাণে বহু উন্নত ভ্যারাইটির অর্কিডের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়ে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ সংযোগ এবং কলচিসিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্কিডের আকর্ষণ তার ফলে অনেক বেড়ে গেছে।

এই অর্কিড বা ক্যাকটাস মানুষের বড় শখের জিনিস। মানুষের রুচিবোধ এবং আনন্দবোধ দুইয়েরই পরিপোষক। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর রূপ আছে যা সম্ভোগ করলে রূপের তৃষ্ণা আরও বেড়ে যায়, পৃথিবীর অসংখ্য অর্কিড ক্লাব এবং ক্যাকটাস সোসাইটীর

হাজার হাজার সভ্যদের জীবনব্যাপী রূপ ও রসসুধা পানের পরিমাণ দেখলে সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

দশ

ডুমুরের ফুল কি দেখা যায়? দেখার সঙ্গে থাকার সম্পর্ক অনেক সময়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা অনেক জিনিস থাকলেও দেখতে পাই না, আবার না থাকলেও অনেক কিছু মনে হয় যেন আছে। দেখার মত করে দেখতে আমরা কজন পারি? শুধু ডুমুর কেন? ডুমুর জাতীয় অন্যান্য গাছ—বট, অশ্বত্থ, পাকুড় এদের ফুল হয় কি না ক'জন দেখেছেন? অথচ এদের ফলের কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যাঁরাই কৌতূহলী, তাঁরাই জানেন কচি অবস্থায় বট বা ডুমুরের ফলগুলিই আসলে কতকগুলি ফুলের সমষ্টি মাত্র। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ত্রী এবং পুরুষ ফুল ফুটে থাকে তথাকথিত এই ফলের মধ্যেই। স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের সঙ্গে আর এক রকম লিঙ্গহীন ফুলও থাকে যার মধুরসে পুষ্ট হয়ে এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ ডুমুরের মধ্যেই বাস করে, এরাই পরাগ বয়ে নিয়ে যায় পুরুষ ফুল থেকে স্ত্রী ফুলে। ডুমুর ফুলের সঙ্গে এই পতঙ্গদের সহ-অবস্থানের বিষয়টি সত্যই বিস্ময়কর; যার সম্পূর্ণ তথ্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

ফুলের সঙ্গে ফলের সম্পর্ক অতি নিবিড়। ফুল থেকে ফল, তাই থেকে বীজ, নূতন জীবনের সূচনা। গাছের ফুল প্রাণীর যৌন-প্রত্যঙ্গেরই সামিল কিংবা তার থেকেও কিছু বেশী। উদ্ভিদকুলের জীবন-বৈশিষ্ট্য যত বেশী নির্ভরশীল তার ফুলের ওপর, অন্য কোন অঙ্গের ওপর তত নয়। ফুলের গঠন এবং তার স্ত্রী ও পুরুষ অংশ-গুলির বিন্যাসের উপর নির্ভর করেই উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ অনুধাবন করা হয়ে থাকে।

অধ্যাপক এডলফ এঙ্গলার মনে করেন ক্রমবিকাশের ধারায় ডুমুর, অশ্বত্থের মত দ্বিবীজপত্রী-উদ্ভিদের পূর্বে আবির্ভাব ঘটেছিল কেয়া, হোগলার মত একবীজপত্রী-উদ্ভিদের এবং কেয়াজাতীয় উদ্ভিদ থেকেই অন্যান্য একবীজ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটেছে যুক্তভাবে সমান্তরাল দুইটি ধারায়। অধ্যাপক হাচিনসন অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন, তিনি বলেন উন্নত পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল শক্ত ডালওলা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের এবং তাই থেকে নরম ডালওলা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের এবং পরিশেষে একবীজ-পত্রী উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

কেয়াঃ পৃথিবীতে সত্যকার ফুল সর্বপ্রথম কোন্ গাছে ফুটেছিল তা সঠিক করে বলা শক্ত, তাহলেও কেয়াগাছের জীবনে যে আদিম বৈশিষ্ট্যগুলির সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা উপেক্ষা করাও সহজ নয়! কেয়া ফুলের কোন পাপড়ির সৌন্দর্য নেই, সত্যকার বৃতিও (ক্যালিক্স) নেই। নগ্ন, নিরাভরণ রাশি রাশি পুং কেশর ফুটে থাকে একটি বিশেষ পাতার ফাঁকে। যে গাছে পুরুষ ফুল ফোটে সেই গাছে স্ত্রী ফুল দেখা যায় না, স্ত্রী ফল ফোটে স্বতন্ত্র একটি গাছে। স্ত্রীফুল-গুলিরও কোন পাপড়ি নেই, ফিকে বাদামী রঙের এক বিশেষ পাতার ফাঁকে অজস্র স্ত্রী ফুল ফুটে থাকে। বাতাসের সাহায্যেই এদের পরাগ সংযোগ ঘটে, পতঙ্গের সাহায্যে নয়। অনেকে মনে করেন এই বৈশিষ্ট্যগুলি আদিমরূপেরই প্রতীক।

আমাদের দেশের জলা জমিতে এবং সুন্দরবনের উপকূল অঞ্চলে কেয়া গাছের আধিপত্য দেখা যায়। কতকগুলি মোটা শিকড়ের ওপর ভর করে বৃদ্ধের মত একটু কাত হয়ে গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। কেয়া গাছের পাতা সরু এবং দীর্ঘ, পাতার দুই কিনারায় এবং মাঝের শিরা বরাবর সুতীক্ষ্ণ কাঁটার সারি আছে, যার জন্য অতি দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে কেয়ার জঙ্গল। কেয়ার পাতাগুলি কাণ্ডের গায়ে স্ক্রুর মত পাক খাওয়া একটি লাইন বরাবর বিন্যস্ত থাকে, বড় চমৎকার

দেখতে হয় গাছগুলিকে তাই জন্য। ইংরাজীতে কেয়া গাছের নাম তাই স্ক্রু-পাইন।

কেয়া আমাদের দেশে বেশ প্রাচীন গাছ। কালিদাসের মেঘদূতম্, রঘুবংশম্, কুমার সম্ভবম্ এবং ঋতু সংহারম্ কাব্যে সৌগন্ধময় কেতকীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেয়া ফুলের গন্ধ তীব্র এবং মিষ্ট, এক মধুর বেদনার মত অবশ করে রাখে অনুভূতিকে। কেয়া ফুলের অপূর্ব সুরভির সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যময় জাতীয় রসবোধের সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে মস্তিষ্ক ও হৃদরোগের প্রতিষেধক হিসাবে কেয়ার পাতা ও ফুলের ব্যবহার-বিধির উল্লেখ আছে। কেয়া ফুলের নির্যাস থেকে কয়েকটি সুগন্ধি এবং কেওড়ার জল তৈরি হয়। কেয়ার শিকড় অনেক সময় কর্কের বদলে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কেয়ার নাম প্যানাডানস্ টেকটোরিয়াস, এরা প্যানডানেসী গোত্রভুক্ত।

কেয়া

কলাঃ সভ্যতার ইতিহাসের সূচনা থেকেই কলার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছিল। ভারত ও মিশরের প্রাচীনতম চিত্রে কলাগাছের ছবি দেখা যায়। পৃথিবীর ঠিক কোন্ অঞ্চলে কলার প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল তা নিশ্চয় করে বলা আজ শক্ত। অনেকে মনে করেন আসাম, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের অরণ্য অঞ্চলেই কলাগাছের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। এইখান থেকেই পৃথিবীর

অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এই গাছটি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে আরবরা ভারতবর্ষ থেকে কলাগাছ নিয়ে যায় আফ্রিকায়—বিশেষতঃ মিশরে, সেইখানেই ইওরোপীয়রা প্রথম কলার আস্বাদলাভের সুযোগ পায়। আমেরিকার একচেটিয়া কলার ব্যবসা আরম্ভের পূর্বে ইওরোপে এই ফলটি ছিল এক মহাবিলাসের সামগ্রী। ডিসরেলী মনে করতেন পৃথিবীর সব থেকে উপাদেয় বস্তু হল কলা। আমেরিকা থেকে বহু প্রয়োজনীয় গাছপালা আমরা লাভ করেছি, আনারস, আতা, তামাক, ক্যাকটাস—এগুলি আমেরিকারই সম্পদ, তার পরিবর্তে আমেরিকা লাভ করেছে কলা। কলাই মধ্য আমেরিকার রাজ্যগুলির ভাগ্য আজ ফিরিয়ে দিয়েছে। তাদের বর্তমান স্বচ্ছল অবস্থার জন্য বহু পরিমাণে দায়ী এই ফলটিই। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রাইয়ার টমাস দা বারলাঙ্গা নামে জনৈক মিশনারী প্রথমে আমেরিকার কাছাকাছি একটি দ্বীপে কলা গাছ নিয়ে যান, যার চারা অচিরেই অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে আমেরিকায় গিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। পৃথিবীর বাজারের প্রধান ছুটি ফল আপেল ও আঙুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ কলা নিজের জায়গা করে নিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ যে ছুটি ভ্যারাইটির কলা সব থেকে বেশী পছন্দ করে তাদের নাম হল গ্রো-মিশেল ও ক্যাভাণ্ডিস্। একমাত্র গ্রো-মিশেল ভ্যারাইটির কলাই বছরে বিক্রি হয় প্রায় চার কোটি ডলার।

আমাদের দেশে আমের পরই কলার স্থান। দক্ষিণ ভারতের চক্রকেলি; বাংলার মর্তমান, চাঁপা, কাবুলী প্রভৃতি কলা খুবই উপাদেয়। কলাগাছের উচ্চতা যাই হোক না কেন আসলে কলা গাছ একটি চারা জাতীয় গাছ (হার্ব) মাত্র। কলাগাছের কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির তলায় থাকে, ওপরে যা দেখি তা একটি ভুয়া কাণ্ড মাত্র, পাতার গোড়াগুলি পরস্পর জড়িয়ে এটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফুল ফোটার সময় মাটির তলার কাণ্ডটি মাথায় ফুলের স্তবক বা মোচাটি নিয়ে প্রসারিত হতে থাকে এবং ভুয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পথ

করে নিয়ে মোচাটি ঝুলিয়ে দেয় মাথা থেকে। প্রসারিত কাণ্ডটিই থোড় হিসাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। মোটের ওপর মোচার মধ্যে তিন জাতের ফুল দেখা যায়—পুরুষ, স্ত্রী ও লিঙ্গহীন ফুল। মাত্র স্ত্রী ফুলগুলিই কলায় পরিণত হয়। লিঙ্গহীন ফুলগুলি থাকে মোচার শেষ প্রান্তে, সেগুলির কোনদিনই কলায় পরিণত হবার সম্ভাবনা নেই। অধিকাংশ উপাদেয় কলাই বীজশূন্য, এদের ফুলে পরাগ সংযোগের তাই প্রশ্ন ওঠে না। মাটির তলার কাণ্ড এবং তেউড়ের সাহায্যেই বংশবিস্তার ঘটে।

কলা একটি অতি উচ্চ শ্রেণীর ফল। পৃথিবীর বহুদেশে পাকা কলা রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। আফ্রিকায় ঘানা প্রভৃতি অঞ্চলে কলা অন্যতম প্রধান খাদ্য। শুকনো কলার ছাতুও একটি পুষ্টিকর পথ্য, ভারতের অনেক প্রদেশে এই পথ্যটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে বেশ ভাল জাতের কলায় আছে শতকরা ৭ থেকে ১৫ ভাগ চিনি, ৩ থেকে ৭ ভাগ স্টার্চ, ১½ ভাগ প্রোটীন, ½ ভাগ স্নেহ জাতীয় পদার্থ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'এ' ও 'সি', তাছাড়া সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থের লবণও কিছু কিছু আছে। অনেকের মতে কলা আপেলের থেকেও শ্রেষ্ঠ ফল। কলার বৈজ্ঞানিক নাম মিউসা স্যাপিয়েনটাম, এরা মিউসেসী গোত্রভুক্ত
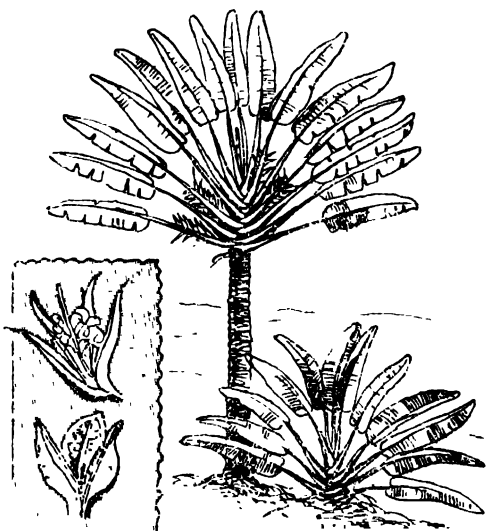
পান্থ পাদপ

উদ্ভিদ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই গোত্রের একটি গাছ থেকে (ম. টেক্সটাইলিস) তন্তু পাওয়া যায়, এরই নাম ম্যানিলা হেম্প। জাপানেও এই শ্রেণীর আর একটি গাছ (ম. ব্যাসজু) থেকে এই জাতীয় তন্তু পাওয়া যায়। বিচিত্র দর্শন পান্থপাদপও (র‍্যাভেনেলা ম্যাডাগাস্‌কারিয়েনসিস্‌) এই গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ, চালচিত্রের মত এদের পাতাগুলি কাণ্ডের মাথার ওপর সাজান থাকে।

নারিকেল ঃ প্রাচীন যুগে আরবগণ এবং মার্কোপোলো প্রভৃতি পর্যটকগণ নারিকেলের নাম দিয়েছিল ভারতীয় ফল। বছর দশেক আগে ডক্টর কাউল রাজস্থানের মরুভূমিতে নারিকেলের ফসিলও আবিষ্কার করেছেন। তবু এটা ঠিক নারিকেলের আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ নয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের ধারণা এই গাছটির প্রথম উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী অঞ্চলে। সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে গিয়ে বিস্তারলাভ করেছে এই গাছটি। নারিকেলের ভ্রূণ ফলের ভেতরে পুরু ছোবড়ার আবরণে বহুদিন অবধি তাজা থাকে। তবে সমুদ্রের লোনা জলের সংস্পর্শে এদের যে একেবারেই কোন ক্ষতি হয় না সে ধারণা অবশ্য ঠিক নয়। কোনটিকি অভিযানে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা বলেন যে নারিকেলগুলিকে তাঁরা ভেলার তলায় বেঁধে রেখেছিলেন তাদের অঙ্কুরোদ্গম শক্তির বেশ ক্ষতি হয়েছিল, অথচ ভেলার ওপরে যেগুলি ছিল তাদের ক্ষতি হয়েছিল অনেক কম। সমুদ্র ছাড়াও মানুষের সহায়তায় পৃথিবীর নানা দেশে এই গাছটি যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে।

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন দলিল বেদে নারিকেলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বেদের পরবর্তী যুগে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের আমলে অবশ্য নারিকেলের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। এই সময়ই মনে হয় নারিকেলের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় ঘটেছিল আমাদের। বিলম্বে হলেও নারিকেল নিজগুণে খাঁটি ভারতীয় ফলে

পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের নানা লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে, পূজা-অর্চনায়, নারিকেল আজ আম কলা ধানের পাশেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে নারিকেলের মিতালি প্রাচীন যুগেও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে সমুদ্র দেবতা বরুণের পূজার সময় নারিকেলের অর্ঘ্য দেওয়া হয়ে থাকে। মালাবার উপকূলের বাসিন্দাদের মধ্যে এই রকম জনশ্রুতি আছে স্বয়ং পরশুরাম রাজ্যের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য স্বর্গ থেকে নারিকেল গাছ এনেছিলেন। কেরেলা শব্দের অর্থই হল নারিকেলের রাজ্য। বলা বাহুল্য এই রাজ্যের অধিবাসীরা প্রবাদটি বাস্তবে পরিণত করেছে।

একটিমাত্র গাছ মানুষের যে কত অজস্র প্রয়োজন মেটাতে পারে নারিকেল তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু নারিকেল নয়, এই গোত্রের গাছ —তাল, তালি, খেজুর, সুপারী, গোলপাতা, আফ্রিকার অয়েল পাম সকলেরই অশেষ গুণ। নারিকেলের মত আফ্রিকার অয়েল পাম (ইলাইস গিয়েনেন্‌সিস) পর্যাপ্ত তেল সরবরাহ করে থাকে। সুন্দরবনের গোলপাতার গাছ দেয় ছাউনির জন্য পাতা। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর অতিকায় ফল লোডাইসিয়া বা ডবল কোকো-নাটের নাম করা যেতে পারে, এই গাছটি নারিকেলেরই সগোত্র, এর ২—২½ ফুট দীর্ঘ, দ্বিধাবিভক্ত অতি বৃহৎ ফলগুলি দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই ফলটি গাছে পাকতে প্রায় ১০ বছর সময় লাগে। ডবল কোকোনাটের শুকনো মালা আমাদের দেশের ফকিরদের হাতে দেখা যায় ভিক্ষাপাত্র হিসাবে। আমাদের বোটা-নিকাল গার্ডেনের পাম হাউসের মধ্যে এই গাছ একটি আছে, গাছটির বয়স বেশী নয়, কাণ্ডের দৈর্ঘ্যও অতি সামান্য, কিন্তু এরই মধ্যে এর বিরাট পাতাগুলি পাম হাউসের জালতি ঘেরা ছাদ স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে। এত বিরাট পাতাও অন্য গোষ্ঠীর গাছের মধ্যে বিরল।

নারিকেল গাছের অবয়ব আমাদের সকলেরই পরিচিত। সরল

অতি দীর্ঘ কাণ্ড, মাথায় ১৫ থেকে ৩০টি পাতার ঝাড়। নারকেল জাতীয় গাছের কদাচিৎ একটি মাথার বদলে কয়েকটি মাথা দেখা যায়। ফুলের কুঁড়ি থেকে ফল হয়, পাতার কুঁড়ি থেকে পাতা হয়। এই জাতীয় গাছে সাধারণতঃ একটিমাত্র পাতার কুঁড়ি থাকে তাই পাতাগুলি খুলতে থাকে একটি মাত্র কাণ্ডকে অবলম্বন করেই। কিন্তু কোন কারণে পাতার কুঁড়িটি নষ্ট হয়ে গেলে গোটা গাছটাই মরে যায়, অতি বিরল ক্ষেত্রে মৃত কুঁড়িটির আশে পাশে দু-একটি নূতন পাতার কুঁড়িও ধরে, এইগুলিই কালক্রমে পাতা খুলতে খুলতে একাধিক মাথাওলা গাছের সৃষ্টি করে।

নারিকেলের ফুলের কুঁড়ি ধরে স্তবকে স্তবকে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একলিঙ্গ-ফুল। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল একই স্তবকে ফোটে। স্তবকের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ ফুট। স্ত্রীফুলগুলির গর্ভাশয় পরিপক্ক হয়ে ডাবের কাঁদিতে পরিণত হয়। নারিকেলের এক প্রান্তে তিনটি করে চোখ থাকে, বাস্তবিক পক্ষে এগুলি পাতলা ছালের আবরণে ঢাকা তিনটি রন্ধ্রমাত্র, যার কোন একটির সঙ্গে নারিকেলের ভ্রূণ থাকে সংলগ্ন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লবণাক্ত উপকূল-ভূমিই নারিকেলের প্রিয় আবাসস্থল। নীরা, নিরালি, নিউর, নিও, নিওগ, নিওল প্রভৃতি নানা রকম নাম শোনা যায় এখানকার নারি-কেলের। লক্ষ্য করবার বিষয় অধিকাংশ নামই 'ন' দিয়ে শুরু। এই সব অঞ্চলে একজাতের বিরাট সামুদ্রিক কাঁকড়াকে নারিকেল গাছের ওপর বাস করতে দেখা যায়। আসলে স্থানীয় অধিবাসীরা এই কাঁকড়াগুলিকে নারিকেল গাছের ওপর চড়িয়ে দেয় পালন করবার উদ্দেশ্যে, এই কাঁকড়াগুলি নারিকেলের শাঁস খেয়ে বড় হয়, মানুষেরা তাদের মাস খেয়ে পরে পরিতৃপ্ত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে নারিকেলের নাম কোকোস নিউসিফেরা, এরা পামী গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ।

এগারো

কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেই আমাদের মনোযোগ এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু উদ্ভিদের ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক। শুষ্ক পাথরের বুকে, সমুদ্রের গভীরে, বাতাসের মধ্যে, এমন কি মানুষের দেহের ওপরও অনেক রকম উদ্ভিদ বসবাস করে থাকে। এরা বিচিত্ররূপিণী মস্, শ্যাওলা ও ছত্রাকের দল, সন্দেহ নেই এরা কৌলীন্য হীন, ক্রমবিকাশের আদিম স্তরে এরা আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু এদেরও প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবিকাশের স্রোত বহে গেছে যুগ যুগান্তর ধরে, যার ব্যাপ্তিকাল তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের থেকে কোন অংশে কম নয়। তার ফলে এদের রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে নব নব বৈচিত্র্যে। ধান, গম, বট, অশ্বত্থের মত উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের আবির্ভাবের পূর্বে যে শ্রেণীর উদ্ভিদেরা পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করেছিল তাদের অধিকাংশ প্রজাতিই আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে চিরতরে, তাদের শিলীভূত দেহাবশেষ আজও নদীর অববাহিকায়, মাটির তলায় খুঁজলে অজস্র পাওয়া যায়। এরা ছিল নগ্নবীজ বা জিমনোস্পারম্ শ্রেণীর উদ্ভিদ। এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় এরাই ছিল উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের উত্তর পুরুষ। এই আদিম উদ্ভিদগুলির শাখায় ফুলের কোন বাহার ছিল না। ফুল অবশ্য ছিল, তবে তাতে কোন সত্যকার পাপড়ি ছিল না। নিছক প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু দরকার আদিম যৌন প্রত্যঙ্গগুলি ছিল ততটুকুই বিকশিত। সেটি ছিল একটি মোচার মত দেখতে, শুধু নগ্ন ডিম্বকোষ ও পরাগবাহী পত্রগুলি সংলগ্ন থাকত তার গায়ে, অনেকের বীজ ছিল পাখনাযুক্ত, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত চারিদিকে। এদেরই জীবিত দূর বংশধরেরা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সাইকাস ওকনিফারের দল। এদের দেহে আদিম পূর্বপুরুষদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আজও দেখা যায়।

সাইকাস একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল খেজুর, এদের পাতাগুলি অনেকটা খেজুরগাছের মত বলেই এই নাম। এদের আয়ুষ্কালও অতি দীর্ঘ, অনুকূল পরিবেশে অনায়াসেই এরা হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে, এদের বৃদ্ধিও হয় অতি ধীরে ধীরে। সাইকাস থেকে কনিফারের আধিপত্য আজ পৃথিবীতে অনেক বেশী। আমাদের দেশে হিমালয়ের পাদদেশে প্রায় ৭ হাজার ফুট অবধি উচ্চতায় এদের নিবিড় সমাবেশ দেখা যায়। অরোকেরিয়া, জুনিপার, কিউ প্রেসাস, থুজা, সেড্রাস সবই কনিফার গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলেও এদের যথেষ্ট দেখা যায়, বাংলাদেশের বাগানেও এরা বিরল নয়।

বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বীরবল সোহানী ও তাঁর সহকর্মীরা আমাদের দেশের অধুনালুপ্ত প্রাচীন উদ্ভিদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফসিলগুলি সন্নিবেশিত করে লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের বিস্মৃতপ্রায় জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস। সেই ইতিহাস মিলিয়ে দেখেছেন অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার অবলুপ্ত উদ্ভিদের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে। অধ্যাপক ভেগ্নার একদিন বলেছিলেন পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলের মহাদেশগুলি বহু যুগ আগে পরস্পর জোড়া ছিল, এশিয়া থেকে স্থলপথেই দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যাওয়া যেত। নানা ভূতাত্ত্বিক কারণে তারা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সাইকাস

অধ্যাপক সোহানী ভেগ্নারের মতবাদের যথার্থতার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন অতি প্রাচীন যুগে বিভিন্ন মহাদেশের অধুনালুপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে, তাই থেকে মনে হয় এই মহাদেশগুলির মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান সেই সময়ে ছিলনা, নইলে হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে এই সব উদ্ভিদের পরিব্যাপ্তি সম্ভব হত না, যেটা সম্ভব হয়নি পরবর্তী যুগে, কলা, তামাক, আনারসের বেলায় যখন মহাসাগরের ব্যাপ্তিতে মহাদেশ-গুলির বাহুডোর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেই অতি আদিম যুগে মানুষের আবির্ভাব হয়নি, সুতরাং মানুষের দ্বারা দীর্ঘ সমুদ্রপথ লঙ্ঘন করে আদিম উদ্ভিদগোষ্ঠীর পৃথিবীব্যাপী বংশবিস্তার ঘটেছিল সেটাও ঠিক নয়।

একই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এই নগ্নবীজ উদ্ভিদের আধিপত্য সত্যই বিস্ময়কর। এদের সঙ্গে আদিম ফার্ণের দলও ছিল। পৃথিবীর বিপুল কয়লাসম্পদের জন্য মানুষ কৃতজ্ঞ এদের কাছে। কোল-এজ বা কয়লার যুগ বলে সেই কালকে যখন এরা মাটির তলায় চাপা পড়ে সৌর-শক্তির কিছু অংশ সংরক্ষিত করে রেখে-ছিল কয়লায় রূপান্ত-রিত হয়ে।

ফার্ণ

আদিম যুগের কয়েক শ্রেণীর ফার্ণের চেহারা ছিল অতি বিরাট। কয়লাখনির অন্ধকার গহ্বরে অথবা মাটির তলায় তাদের ফসিলের ইতস্ততঃ

টুকরো আজও ছড়িয়ে আছে। বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে এই অতিকায় ফার্ণেরাই প্রথম জন্ম দিয়েছিল নগ্নবীজ শ্রেণীর উদ্ভিদের। বিবর্তনের স্রোতে মনে হয় ফার্ণেরা এসেছিল প্রথম ডালওলা স্থলবাসী উদ্ভিদের রূপ ধরে। ফুলের কোন চিহ্নই নেই ফার্ণের দেহে, সেদিন ছিল না আজও নেই। বংশবিস্তারের পদ্ধতি আদিমতর। সবুজ পাতার তলায় অজস্র স্পোর বা বীজরেণুর সৃষ্টি হয়, স্পোরগুলি অঙ্কুরিত হয়ে সৃষ্টি করে হরতনের মত আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদের—এদের নাম প্রোথেলাস। বাস্তবিক পক্ষে এখান থেকেই শুরু হয় ফার্ণের জীবনের আর একটি অধ্যায়। প্রোথেলাসের ওপর গজায় স্ত্রী ও পুরুষ অংশ। পুংকোষ ও ডিম্বকের মধ্যে মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় আবার পাতাওলা ফার্ণের। দুইটি অধ্যায়ের মধ্যে জীবনের এই আবর্তন, এই বৈশিষ্ট্য শুধু ফার্ণের বেলায় নয়, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ, প্রাণী, এমনকি মানুষের বেলায়ও দেখা যায়। মাতাপিতার দেহের যা ক্রোমোসোম-সংখ্যা তার ঠিক অর্ধেক থাকে তাদের জননকোষে (যেটি জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিচয় বহন করে)। দুইটি জননকোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট ভ্রূণের দেহে ক্রোমো-সোম-সংখ্যা আবার দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং ফিরে পায় জন্মদাতার দেহকোষের নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম-সংখ্যা। বংশপরম্পরায় ক্রোমো-সোমই বহন করে নিয়ে যায় জীবের বৈশিষ্ট্য ধারা এবং প্রজাতি বিশেষে এর নির্দিষ্ট সংখ্যারও কোন পরিবর্তন হয় না তাই সহজে।

ফার্ণের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। বহু শ্রেণীর ফার্ণ আছে আমাদের দেশে, টেরিস, সিলাজিনেলা, ইকুইসিটাম, লাইকো-পোডিয়াম, সবই এই বিরাট ফার্ণগোষ্ঠীর অন্তর্গত। দার্জিলিংয়ে খেজুর গাছের মত ১৫—২০ ফুট দীর্ঘ ট্রিফার্ণ আছে। এই বিরাট চেহারা এদের আদিম পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফার্ণেরা এসেছিল কোথা হতে ? ফার্ণের উৎপত্তির সূত্রসন্ধানের কালে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি পড়ে মসজাতীয় উদ্ভিদের ওপর। ফার্ণের থেকে তাদের জীবন আরও সরল, আরও আদিম। মাটির ওপর

বুক পেতে এরা পড়ে থাকে, ফার্ণের মত উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সত্যকার কোন কাণ্ড বা শিকড় নেই। বর্ষাকালে পুরানো পাঁচিলের গায়ে বা মাটির ওপর এরা সবুজ ভেলভেটের আস্তরণ বিছিয়ে রাখে। ফার্ণের মত মসের দেহেও কোন ফুল ফোটে না, এদের বংশবিস্তারের পদ্ধতিও অনেকটা ফার্ণের মত। রিকসিয়া, মারকেনসিয়া, লেজুনিয়া, এনথোসেরস এই জাতীয় উদ্ভিদ।

মারকেনসিয়া

মসের থেকে আরও আদিম উদ্ভিদ হল শ্যাওলা বা অ্যালগি। জলের মধ্যে এবং ভিজা মাটির ওপর শ্যাওলার রাজত্ব। শত শত—প্রজাতির শ্যাওলা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, তাদের রূপ ও জীবন ইতিহাস রূপকথার মতই বিস্ময়কর। মাইক্রোসকোপের তলায় একফোঁটা জলের মধ্যে ডায়াটম-জাতীয় শ্যাওলার যে অপূর্ব কারু-কার্যময় রূপ ফুটে ওঠে তা পৃথিবীর অতি বড় শিল্পীকেও বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিতে পারে। বর্ণবৈষম্য শুধু মানুষের সমাজে নয়, শ্যাওলার সমাজেও অত্যন্ত প্রকট। নীলচে-সবুজ, সবুজ, লাল, পিঙ্গল প্রভৃতি চার জাতের শ্যাওলা দেখা যায়। এদের মধ্যে নীলচে-সবুজ রঙের শ্যাওলাই মনে হয় সবচেয়ে আদিম ও বন্য। এরাই মনে হয় ব্যাকটেরিয়া থেকে খাঁটি উদ্ভিদের জীবনের দিকে প্রথম পা ফেলেছিল। সরু চুলের মত দেখতে, গ্যালভানোমীটারের কাঁটার মত ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ নড়াচড়াও করতে পারে। শান্ত, সভ্য উদ্ভিদের দৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য বন্যরূপেরই প্রতীক। নীলচে-সবুজ শ্যাওলা মানুষের পরম বন্ধু, মাটিকে এরা উর্বর করে তোলে জৈবক্রিয়ার বাতাসের নাইট্রোজেন সংযুক্ত করে। কয়েক জাতীয় ব্যাকটেরিয়াও অবশ্য এই কাজে যথেষ্ট পারদর্শী।

সবুজ কণিকা উদ্ভিদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। শ্যাওলার আদিম দেহকোষেই সবুজ কণিকার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল। ব্যাকটেরিয়ার দেহে সত্যকার কোন সবুজ কণিকা নেই, তাহলেও কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া আপনার খাদ্য আপনারাই তৈরি করে নিতে পারে ক্লোরোফিলের মত কয়েকটি বর্ণের সহায়তায়। সবুজ কণিকার সঙ্গে আলোকের মহান বন্ধুত্বের ইতিবৃত্ত প্রথম লেখা হয়েছিল শ্যাওলার জীবনেই। এই বন্ধুত্ব শুধু খাদ্য তৈরির কাজেই শেষ হয়ে যায় নি, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, গতিবৃদ্ধি, এমনকি ফুল ফোটার সময় পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে আলোকের বৈশিষ্ট্য ও দিন রাত্রির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে! এই বিষয়ে অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন সরকারের পরীক্ষাগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণার ফলাফল সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সবুজ রঙের শ্যাওলা ছাড়াও লাল ও পিঙ্গল রঙের শ্যাওলার দেহেও যথেষ্ট সবুজ কণিকা আছে, অন্যান্য রঙের আধিক্যে তাদের সবুজ রঙ ঢাকা থাকে। এই জাতীয় অনেক শ্যাওলা সাগরের জলে বাস করে। এই জাতীয় সামুদ্রিক শ্যাওলার দেহ থেকে আগার আগার নামে খাদ্য এবং কেল্প নামক শ্যাওলা থেকে আইওডিন পাওয়া যায়। অনেক দেশের অগভীর সমুদ্রোপকূলে এই সামুদ্রিক শ্যাওলার চাষ হয়। ডায়াটম-জাতীয় শ্যাওলারা যখন মরে যায় তখন রেখে যায় সূক্ষ্ম কণার মত দেহাবশেষগুলি, প্রবাল কীটের মত সেগুলি ক্রমশঃ জড়ো হয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের সৃষ্টি করে। বহু উল্লেখযোগ্য শিল্পে ব্যবহৃত হয় তাদের এই দেহাবশেষ। শ্যাওলারা আপনাদের দেহ দু টুকরো করে, অযৌন বীজরেণুর সৃষ্টি করে অথবা স্ত্রী ও পুং-কোষের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বংশবিস্তারের কৌশলগুলি আয়ত্ত করেছে।

এই প্রসঙ্গে আর এক বিচিত্র শ্রেণীর উদ্ভিদ ছত্রাক সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই বিবরণ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই মাথায় সাদা টোপর পরে ব্যাঙের ছাতা ঘরের চৌকাঠের কোণে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বড় হয়ে উঠতে লাগল এবং কয়েক

দিনের মধ্যেই আবার শুকিয়ে গেল, এ দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। ছত্রাকের স্পোর বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে বহু
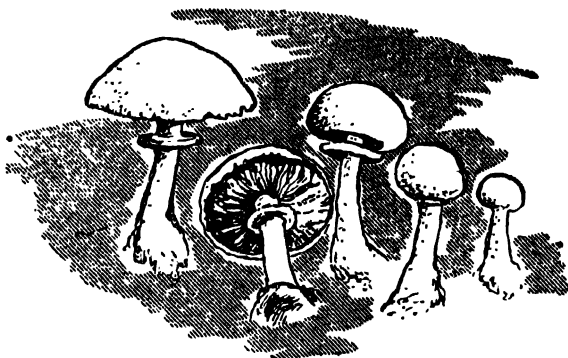
ছত্রাক

দূরে এবং সুবিধা পেলেই অঙ্কুরিত হয়। শত শত প্রজাতির ছত্রাক ছড়িয়ে আছে আমাদের চারি পাশে। এদের কতকগুলি গোষ্ঠী অন্য গাছের ওপর অথবা মাঠ-ভরা ফসলের ওপর আক্রমণ ঘটায় এবং প্রচুর ক্ষতি করে। মানুষের দেহকেও এরা বাদ দেয় না, কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে এরা আমাদের দেহে। কয়েকটি নির্দোষ, সুস্বাদু প্রজাতির ছত্রাককে অবশ্য আমরাই আহার করে থাকি পরম তৃপ্তির সঙ্গে। চীনা, ফরাসী, এবং পূর্ববঙ্গের গৃহিণীরা ছত্রাকের ব্যঞ্জন খুবই পছন্দ করেন। আরগট, পেনিসিলিন প্রভৃতি ছত্রাককে আমরা আজ বন্ধুতে রূপান্তরিত করেছি। ছত্রাকের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল তার সবুজ কণাশূন্যতা। অন্য জৈব পদার্থ থেকে তাই তাদের আহার সংগ্রহ করতে হয়। ছত্রাকের বংশবিস্তার ঘটে স্পোরের সহায়তায়, তবে যৌন বৈষম্য এদের জীবনে যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সে কথা সত্য নয়। আমাদের দেশে বৃক্ষবাসী শক্ত আঁশওলা ছত্রাকের বিচিত্র জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন ডক্টর শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তাঁর এই গবেষণা সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ছত্রাকের সঙ্গে শ্যাওলার অনেক সময় এক বিচিত্র সহ-অবস্থান দেখা যায়। কয়েকটি প্রজাতির ছত্রাক নির্দিষ্ট কতকগুলি শ্যাওলার উপর বসবাস করে। শ্যাওলা তাদের তৈরি খাদ্য যোগায় আর ছত্রাক যোগায় শ্যাও-লাকে জল ও খাদ্যের উপাদান--ঠিক হোস্ট ও পেয়িং গেস্টের সম্পর্ক। সমষ্টিগত-ভাবে এদের নাম লাইকেন। শুষ্কপ্রাণ-হীন পর্বতের ওপর লাইকেনই বয়ে নিয়ে যায় জীবনের প্রথম চিহ্ন। সামান্য বৃষ্টির জল বা বরফ-গলা জল পেলেই লাইকেনের স্পোর অঙ্কুরিত হয়। রুক্ষ পাথরের চেহারা ধীরে ধীরে তারা পাল্টে দেয়, সম্ভব করে তোলে অন্য উদ্ভিদের আগমন। নিজেদের দেহাবশেষ ও সূক্ষ্ম ধূলিকণার মিশ্রণে মৃত্তিকাস্তরের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে একদিন বিশাল অরণ্য মাথা তুলে ওঠে সেখানে—যেখানে প্রাণের চিহ্নমাত্র একদিন ছিল না। এক বিশাল অরণ্যর সৃষ্টির পেছনে অনেক সময়েই গোপন থাকে একটি লাইকেনের আত্মবিস্তারের নিষ্ঠুর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত।

কেল্প

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের মূল স্রোতের মাঝে ছত্রাকের নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে পাওয়া শক্ত। ছত্রাকের কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে সবুজ কণা-বিশিষ্ট কোন উদ্ভিদের আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, উদ্ভিদের আবির্ভাবের আদিপর্বেই ছত্রাকের জীবনস্রোত বয়ে গেছে একটি স্বতন্ত্র সমান্তরাল ধারায়, যেটি আর কোন যুগেই মেলেনি উদ্ভিদের মূল স্রোতের সঙ্গে।

নাম-সূচী